বঙ্গ

কমলবার্তা

আগস্ট সংখ্যা। ২০২৩। মূল্য ২০ টাকা

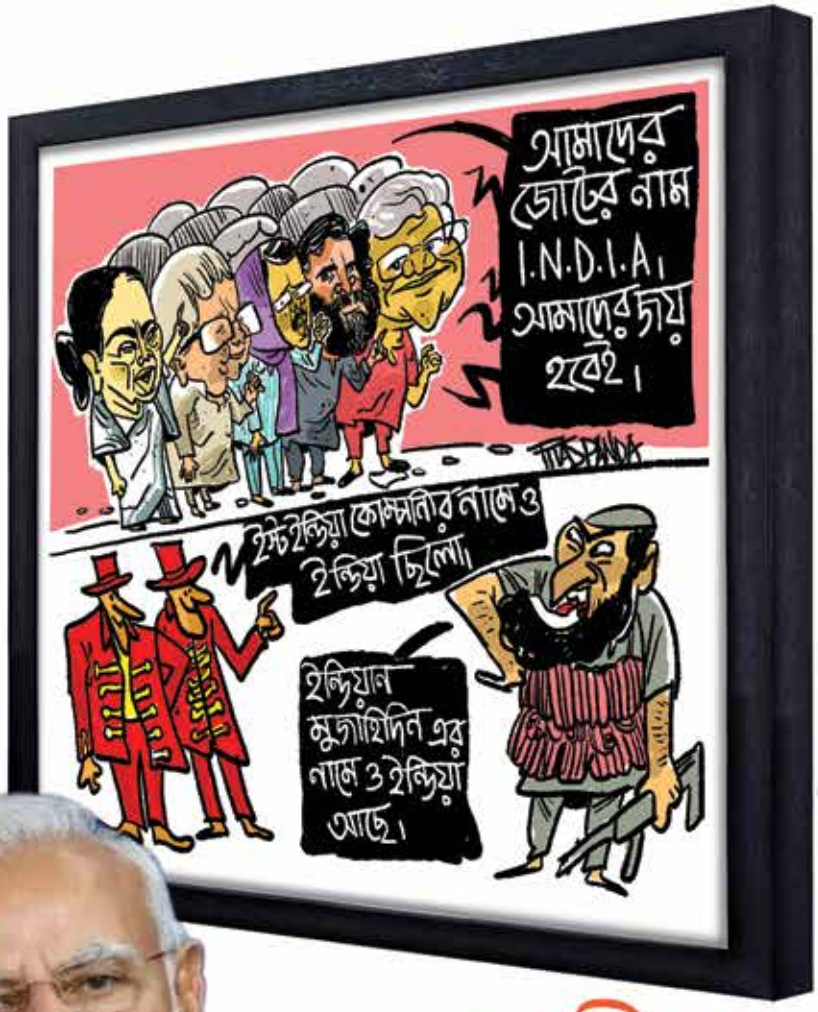

তৃণমূল সন্ত্রাস সত্ত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির বৃদ্ধি ৭৬ শতাংশ

মোদী ঝড়ে ধরাশায়ী I.N.D.I.A. জোট

মাদক মাফিয়া মণিপুর

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবনা

জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবসে শিল্পীদের তৈরি কাজ খুঁটিয়ে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রগতি ময়দানে ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশন ও কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধনে নির্মাণ কর্মীদের প্রণাম জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা

লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সেমিকন্ডাক্ট ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে প্রধানমন্ত্রী

রাজস্থানের সিকার-এ জনসভায় নরেন্দ্র মোদী

বঙ্গ
কমলবার্তা
আগস্ট সংখ্যা। ২০২৩

I.N.D.I.A. বনাম ভারতবর্ষ ৪
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

অধর্মের চক্রব্যূহে ভারত বিরোধী I.N.D.I.A. জোট ৬
অভিরূপ ঘোষ

তিনদিনেই ধূলিসাৎ বিরোধী জোট ১০
জয়ন্ত গুহ

স্বাধীনতার ৭৬তম বার্ষিকীতে নরেন্দ্র মোদীর শ্রেষ্ঠ ভারত ১২
বিনয়ভূষণ দাশ

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মোদী সরকারের বিদেশ নীতি ১৪
বিমল শঙ্কর নন্দ

তৃণমূলের তুমুল সন্ত্রাস সত্ত্বেও বিজেপির বৃদ্ধি ৭৬ শতাংশ ১৮
কৌশিক কর্মকার

ছবিতে খবর ২০

মাদক মাফিয়া মণিপুর ২৪
রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী

বৈষ্ণব মণিপুরে বহিরাগত সন্ত্রাস ২৬
সৌভিক দত্ত

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ২৮
পুলকনারায়ণ ধর

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোকে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ৩০
সৌমিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ফেক নিউজ ৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক: জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, উজ্জ্বল সান্যাল, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় বর্মা

সম্পাদকীয়

দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'মোদী হয়ত অনেক কিছু জানে না কিন্তু মোদী রাজনীতি জানে না এমনটা কখনও ভাববেন না'। হাসির রোল উঠেছিল সংসদ জুড়ে। স্বাধীনতার মাসে দেশের সংসদে বিরোধী জোটের তোলা সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে নরেন্দ্র মোদী আবারও প্রমাণ করলেন তাঁর রাজনৈতিক ধীশক্তির ধারেকাছেও নেই ২৬ দলের 'ঘামান্ডিয়া' (অহংকারী) জোট। মণিপুর নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব খণ্ডন করে তিনি একদিকে যেমন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগেই আরও কাছে টেনে নিলেন সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে। পাশাপাশি যুক্তি-তথ্যে তিনি প্রমাণ করে দিলেন কংগ্রেস এবং পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের নীতিই উত্তর-পূর্ব ভারতে যাবতীয় অশান্তি তৈরির জন্য দায়ী। একই সঙ্গে অনাস্থা বিতর্কে তাঁর বক্তব্যকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে টানটান করে বেঁধে দিলেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সুর। এবং তাঁকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য হাসতে হাসতে বিরোধীদের ধন্যবাদ জানাতেও ভুললেন না।

সংসদে যখন তিনদিন ধরে চলছে অনাস্থা বিতর্ক তখন পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক পঞ্চায়েতে বিজয়ী বিজেপি প্রার্থীদের আবীর মাখা ছবি। জয়ের উল্লাস এবং আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে জয় শ্রী রাম ধ্বনি। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের দুর্নীতি, অপশাসন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জয়ের আনন্দ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে। বাংলায় বিজেপির অসংখ্য কার্যকর্তা, তাঁদের পরিবার এবং মা-বোনদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের 'ঘরের মেয়ে'-র গুন্ডাবাহিনীর অকল্পনীয় অত্যাচার সত্ত্বেও বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬ শতাংশ। ২০১৮ সালের তুলনায় পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে দ্বিগুণ আসনে জিতেছে বিজেপি। এবার জয় মিলেছে ১১ হাজার আসনে। ২০১৮তে যে সংখ্যা ছিল ৫,৬০০। গত পাঁচ বছরে মোট প্রাপ্য ভোটের হার ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩ শতাংশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা জিতেছেন এবং যারা জিততে না পারলেও চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

হয়ত কাকতলীয় কিন্তু এটা বাস্তব যে স্বাধীনতার মাসেই হাওয়া ঘুরতে শুরু করল বাংলায়! শত শহীদের রক্তে এবং নাছোড় আন্দোলনে যে বাংলা একদিন টলিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশরাজের দম্ভ সেই বাংলাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে আবারও যেন স্বাধীনতার হাওয়া। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা। তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা। জেলায় জেলায় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর খুন-ধর্ষণ এবং দাদাগিরির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা। দম্ভ এবং নির্বুদ্ধিতা কখনও দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনা। হবেই দম্ভচূর্ণ। শেষের সেদিন সমাগত। একথা মাথায় রেখে আসুন আমরা স্বাধীনতা পালন করি গোটা মাস জুড়ে।

জয় হিন্দ।

I.N.D.I.A.

বনাম

ভারতবর্ষ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

জেহাদি - খ্রিষ্টান মিশনারি - দলিত-মুসলিম ঐক্যবাদী - মাওবাদী - আর্বান নকশাল - কালচারাল মার্ক্সিস্ট - খালিস্তানি প্রভৃতি গ্রুপ বা রাজনৈতিক দল আগে আলাদা আলাদা হয়ে কাজ করত। এজেন্ডা ভারত বিরোধী এবং ভারতের উন্নয়ন বিরোধী। ভারতবর্ষকে যারা জেনেছে এবং বুঝেছে বিদেশী ভাবধারার চশমায়। এরাই এবার অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে যূথবদ্ধ হয়েছে I.N.D.I.A. জোটে। এজেন্ডা প্রথমত মোদী বিরোধিতা। দ্বিতীয়ত নতুন ভারতের বিকাশ এবং যেকোন ভারতীয় সাফল্যের বিরোধিতা। তৃতীয়ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা।

I.N.D.I.A. বা Indian National Developmental Inclusive Alliance এই গালভরা নাম নিয়ে ২৬টি রাজনৈতিক দল মিলে একটি জোট তৈরি করেছে। ঘোষিতভাবে এরা মোদী-বিরোধী কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এরা প্রকৃতপক্ষে ভারত-বিরোধী। এই জোটের মূল পাণ্ডা অবশ্যই কংগ্রেস। যার নেতা রাহুল গান্ধী কিছুদিন আগেই বলেছিলেন যে, ইন্ডিয়া কোন নেশন নয়, বিভিন্ন রাজ্যের একটি সমষ্টি মাত্র। প্রায়ই বিদেশ সফর করে সেইসব দেশে নিয়মিত ভারত-বিরোধী মন্তব্য করে থাকেন তিনি — যা দেশদ্রোহিতারই সামিল। এই জোটের অন্যতম সঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস। যারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ ও আর্থিকভাবে দেউলিয়া করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পিসি-ভাইপো জুটি।

এই জোটে আছে পাঁচটি বামপন্থী দল— সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিআইএমএল। এই বামপন্থী দলগুলির কাজই হল সারা বছর ধরে দেশ-বিরোধিতা করা ও চীনের দালালি করা। আছে কাশ্মীরের বিচ্ছিনতাবাদী দল ন্যাশনাল কনফারেন্স। এই জোটে আছে কেরালার ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক জেহাদি দল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ।

ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে পাকিস্তান করা মুসলিম লীগের উত্তরসূরি এরা। কিছুদিন আগে এই দলেরই একটি মিছিল থেকে ওঠা হিন্দুদের হত্যা করার ডাকের ভিডিও নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন। এই জোটে আছে ভারতবর্ষের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় জনতা দল বা আরজেডি— যে দলের মাথা লালুপ্রসাদ যাদব বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় বহুবার জেল খেটেছে। আছে উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা-মাফিয়াদের দল হিসাবে পরিচিত সমাজবাদী পার্টি। তো এককথায় বলা যায় এই I.N.D.I.A নামক রাজনৈতিক জোট গঠন আসলে টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের একটা মহাজোট। এই জোটের ছাতার তলায় যত চোর-ডাকাত-মাফিয়া-দেশদ্রোহী-জেহাদি শক্তি একত্রে জড় হয়েছে— যাদের উদ্দেশ্য একটাই দেশটাকে লুঠে-পুটে খাওয়া।

বিগত এক দশক ধরে ভারতবর্ষে এক নব যুগের সঞ্চার হয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ভারত ছিল বিশ্বের দশম বৃহত্তম অর্থনীতি। আজ ভারতবর্ষ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। IMF (International Monetary Fund)-এর হিসাব বলছে ২০২৭-এর মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে— সামনে থাকবে শুধু আমেরিকা ও চীন। বর্তমানে এই ২০২৩ সালে ভারত ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি অর্থনীতি-তে পরিণত হয়েছে। ভারতের UPI (Unified Payment Interface) ব্যবস্থা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে এবং বিশ্বের বহু দেশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। জন ধন একাউন্ট যোজনার মাধ্যমে প্রত্যেকের একাউন্টে সরাসরি সরকারি সহায়তার অর্থ ঢুকে যাচ্ছে কোন মধ্যসত্ত্বভোগী ছাড়া। প্রতি বছর দেশে হাজার হাজার নতুন স্টার্ট আপ গড়ে উঠছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শেয়ার বাজারে ধ্বস নামলেও ভারতীয় শেয়ার মার্কেট রোজ নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে। পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে এই কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। করোনার মত এত বড় মহামারীকে সরকার খুব সুন্দরভাবে মোকাবিলা করেছে। ভারত তার নিজের ভ্যাকসিন তৈরি করেছে এবং তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। ২০২৩-এর ২রা মে পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রথম ডোজ, দ্বিতীয় ডোজ ও বুস্টার ডোজ মিলিয়ে ২২০ কোটির ওপর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে— যা বিশ্বের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে দেড় বছর ধরে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে। করোনার ফলে ইউরোপ-আমেরিকা-চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন দেশে আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এর ফলে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের বড় দেশগুলির মধ্যে ভারত মরুদ্যানস্বরূপ। একসময় ভারত লক্ষ কোটি টাকার ওপর প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানি করত। আর এর ফলে সেই সময়ের ক্ষমতাসীন দলের নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রতিরক্ষা চুক্তি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার কমিশন কামাত। আজ ভারত একটি অস্ত্র আমদানিকারক দেশ থেকে অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। চীনকে গালওয়ানে ও পাকিস্তানকে বালাকোট-এ যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে।

ভারতের এই অগ্রগতিতে প্রতিবেশি দুই শত্রু দেশ চীন ও পাকিস্তানের প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে এরা সমস্ত শক্তি নিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত বিচ্ছিনতাবাদী শক্তিকে জাগরিত করতে চাইছে। তা-ই আজ জেহাদি - খ্রিষ্টান মিশনারি - দলিত-মুসলিম ঐক্যবাদী - মাওবাদী - আর্বান নকশাল - কালচারাল মার্ক্সিস্ট - খালিস্তানি প্রভৃতি সকল দেশবিরোধী ও বিচ্ছিনতাবাদী শক্তি এক ছাতার তলায় জড় হয়েছে- তারই পোশাকি নাম I.N.D.I.A। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া যতটা ভারতীয় এই I.N.D.I.A ও ততটাই ভারতীয়।

সবথেকে খারাপ লাগে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের ও সিপিএমের

সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের কথা ভাবলে। কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু কংগ্রেস ও সিপিএমের সমর্থককে খুন করা হয়েছে। কিন্তু পাটনা ও ব্যাঙ্গালোরে রাহুল-সোনিয়া-ইয়েচুরিদের দেখা গেল মমতার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে একই মঞ্চে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠতে। বঙ্গের সিপিএম-তৃণমূলের ফিসফ্রাই জোট পাটনা ও ব্যাঙ্গালোরে একটি আনুষ্ঠানিক জোটে পরিণত হল। এদিকে বেচারা সিপিএমের ফেসবুক যোদ্ধারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিদি-মোদী সেটিংয়ের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সারাদিন মুখে রক্ত তুলে ফেলছে। তা-ই পশ্চিমবঙ্গে যারা তৃণমূল-বিরোধী, যারা পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতির এই পঙ্কিল অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চান, যারা পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দিতে চান না, যারা চান না তাঁদের ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে চাকরি খুঁজতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র বা গুজরাট চলে যাক তাঁদের কাছে একটিই বিকল্প— ভারতীয় জনতা পার্টি। বর্তমান ভারতবর্ষকে টুকরে টুকরে গ্যাঙয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে শক্তিশালী করতে একজন ব্যক্তিই পারেন যার নাম নরেন্দ্র মোদী। ভারতবর্ষ যেমন তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুগুলির মোকাবিলা করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে বিগত ৯ বছর ধরে এবং একই সঙ্গে তাঁর হাজার হাজার বছরের পুরাতন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জাগরিত হচ্ছে সেরকমই পশ্চিমবঙ্গকেও তার অস্তিত্ব, ঐতিহ্য রক্ষা করতে গেলে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরতেই হবে।

এই পশ্চিমবঙ্গ যা স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, যা নেতাজীর বাংলা, যা স্বামী প্রণবানন্দজীর বাংলা, যা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, যা বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা, যা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা তার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন হলেই শুধুমাত্র এর অস্তিত্ব বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

অধর্মের চক্রব্যূহে ভারত বিরোধী I.N.D.I.A. জোট

অভিরূপ ঘোষ

এটাই প্রথম নয়। প্রতিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যাত্রার চিত্রনাট্য অবশ্য প্রতিবার বদলে যায়। তবে কারণ একটাই। মমতা ব্যানার্জী 'পোধানমন্ত্রী' হতে চান। I.N.D.I.A. - এবারের নতুন যাত্রাপালা। নিজেদের দুর্নীতি এবং হতাশা ঢাকতে, পরিবারকে বাঁচাতে লালু-মমতা-সনিয়া-ইয়েচুরি-দের এই সস্তার যাত্রা কি মেনে নেবে নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত?

'আর নয় একা চাল চুরি / সঙ্গে সোনিয়া - ইয়েচুরি;
আর নয় একা চাকরি চুরি / সঙ্গে অধীর - ইয়েচুরি;
আর নয় একা গরু চুরি / সঙ্গে সোনিয়া - ইয়েচুরি;
আর নয় একা কয়লা চুরি / সঙ্গে রাহুল - ইয়েচুরি;
আর নয় একা ভোট চুরি / সঙ্গে সোনিয়া - ইয়েচুরি।'

সোশ্যাল মিডিয়ার বহুল প্রচলিত এই পোস্ট সম্ভবত এই জোট নামক ঘোঁটের চরিত্রের যথাযথ আয়না। প্রথমে পাটনা আর তারপর ব্যাঙ্গালোরে মেগা মিটিং করে মোদীবিরোধী তথা দেশবিরোধীরা ঠিক করেছে আগামী লোকসভায় তারা জোট গঠন করে লড়বে।

জগাখিচুড়ি, আদর্শহীন, দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ এবং দেশবিরোধী অদ্ভুত এক জোট এটা। নিজের রাজ্যে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা আর ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা মমতা ব্যানার্জি বক্তব্য রাখেন দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা নিয়ে। উল্টোদিকে বসে সেই বক্তব্য শুনে হাততালি দেন বিরোধী জোটের অন্যতম মুখ রাহুল গান্ধী বা সীতারাম ইয়েচুরিরা। একসাথে ডিনার করেন বা ফটো সেশনে মাতিয়ে রাখেন মঞ্চ। পটনা থেকে কিছুটা দূরেই মুর্শিদাবাদের ফুলচাঁদ শেখের বাড়ির লোক তখন হয়তো দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে।

এই মুর্শিদাবাদেরই রাণীনগর এলাকার অরবিন্দ হালদার। কংগ্রেস করতেন। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূলের গুন্ডারা পিটিয়ে মেরে দেয় তাঁকে।

সাইদুল শেখের বয়স ৪৮। হরিনঘাটার বাসিন্দা এই ভদ্রলোক তৃণমূলের অত্যাচার থেকে বাঁচতে আইএসএফ করতেন। সেই তৃণমূলের হাতেই মরতে হয় তাঁকে।

বছর তেইশের মনসুর আলম ভেবেছিল সিপিএম করে তৃণমূলকে উৎখাত করবে পঞ্চায়েত থেকে। সেই তৃণমূলের গুন্ডারা তাঁকে প্রথমে গুলি করে। তারপর বেধড়ক পিটিয়ে চম্পট দেয়। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি যে এই লাশগুলোর উপর দিয়ে হেঁটেই জোট করতে গেছেন সোনিয়া গান্ধী বা সীতারাম ইয়েচুরিরা। সেইসময় যখন অসংখ্য বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি মার খাচ্ছেন-আহত হচ্ছেন-খুন

হচ্ছেন বাম-কংগ্রেসের অনেক বুথ স্তরের কর্মী। সেই কর্মীরা যাঁরা তৃণমূলের চুরি-দুর্নীতি-অপশাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে পঞ্চায়েতে মরণপণ লড়াই করেছিলেন একটা ভুল (সিপিএম বা কংগ্রেসের) পতাকা কাঁধে নিয়ে।

সীতারাম ইয়েচুরি বা সোনিয়া গান্ধী নিশ্চই তৃণমূলনেত্রীর কাছে জানতে চাননি বাংলায় এত সন্ত্রাস কেন! কেন বিজেপির পাশাপাশি তাঁদের কর্মীরাও আক্রান্ত! কেন নির্বিচারে গণতন্ত্রের উপর গুলিবর্ষণ করছেন তৃণমূলনেত্রী বা তাঁর আদরের ভাইপো! জানতে চাওয়ার কথা নয়, কারণ সিপিএম বা কংগ্রেসের কাছে তাদের কর্মীদের লাশগুলো এক একটা সংখ্যা শুধু। তাই বাংলা ডিঙিয়ে মণিপুর গেলেও সন্ত্রাসবিদ্ধস্ত এ রাজ্যে পা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না তাঁরা। তাই কংগ্রেসের জমায়েতে সিপিএমের গুলি চালানোর দিন একুশে জুলাইকে, উড়ে এসে জুড়ে বসা তৃণমূল হাইজ্যাক করে নিলেও কেউ টুঁ শব্দটি করেন না। নিজের কর্মী-সমর্থকদের প্রতি নূন্যতম মমত্ববোধ থাকলে অধীর চৌধুরী অন্তত রাজ্য ছেড়ে মণিপুর ছুটতেন না। লোকসভার বিরোধী দলনেতা বা সিপিএমের খাতায় কলমে সর্বেসর্বা সীতারাম ইয়েচুরি ভুলে যেতেন না প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে। তাই আজ যে কর্মী সমর্থকদের ছেড়ে ওনারা জোটের খেলায় ব্যস্ত, আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা ইয়েচুরির এই ভুলভুলাইয়া ভুলতে পারবেন তো!

I.N.D.I.A. - হাস্যকর এই জোটের নাম। INDIA নয়। পাঁচটি অক্ষরের মাঝে কালো বিন্দুগুলো যা দেশের নামে নেই, সেটা আসলে কারুর ছেলে কারুর ভাই বা কারুর ভাইপোর দুর্নীতি ও কুকর্মের প্রতীক। চোরের মায়ের যেমন বড় গলা হয় ('আমি চোর! কুনাল চোর! মদন চোর!' ইত্যাদি) তেমন নামের কারসাজিতে দেশবিরোধীরা আজ নিজেদের রাষ্ট্রবাদী দেখাতে চাইছে। ভাবটা এমন যেন 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' বড্ড বেশি ভারতকে ভালোবাসতো বা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন নামক জঙ্গি সংগঠন দেশের মানুষের কথা ভেবে রাতে ঘুমাতে পারতো না।

এজেন্ডা কী এই জোটের? ধর্মনিরপেক্ষতা। অদ্ভুত বললেও কম বলা হয়। বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের মতো সংখ্যালঘুকে ভোটব্যাংকে পরিণত করে তোষণ করা দল বা ইন্ডিয়া ইউনিয়ন মুসলিম লীগের মত একপ্রকার মৌলবাদী সংগঠন যাদের সদস্য তারা নাকি ধর্মনিরপেক্ষ!

এই জোট নাকি দুর্নীতিবিরোধী। কে বলছেন? লালু প্রসাদ যাদব। যিনি পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে জেল খাটা আসামি। কে বলছেন? সোনিয়া গান্ধী। মনমোহন সিং রিমোট সরকারকে দিয়ে টু জি স্পেক্ট্রাম কেলেঙ্কারি বা কয়লা কেলেঙ্কারির মতো ঘটনা ঘটানোর অরিজিনাল কারিগর! দুর্নীতি নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে কে? মমতা ব্যানার্জি। চুরিকে একটা সরকারি সিস্টেমে বদলে দেওয়া দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। কার বিরুদ্ধে বলছেন? নরেন্দ্র মোদী —যাঁর বিপক্ষে শেষ ন'বছরে (এবং পূর্ববর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও) একটাও দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীরা আনতে পারিনি।

মোদ্দা কথা হল এই জগাখিচুড়ি জোটের সামনে যুক্তিসঙ্গত কোন এজেন্ডা নেই। এদের লক্ষ্য একটাই। তা হলো নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা। মোদী বিরোধিতার মন্ত্রেই আগামী বছরের লোকসভায় জিতে এনারা ক্ষমতায় আসতে চায়। প্রথমত এই জোট আদৌ টিকবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন আর যদি টিকেও যায় সেক্ষেত্রেও এই জোটের পক্ষে দূরদূরান্ত পর্যন্ত ক্ষমতায় আসার কোন সম্ভাবনা নেই— অন্তত সংখ্যাতত্ত্ব এবং বাস্তবতার বিচারে। বাস্তবতা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

এই জোটের লোকসভায় সদস্য সংখ্যা ১৪১। তার মধ্যে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার ০৬ আর নীতিশ কুমারের জেডিইউয়ের ১৬ (মোট ২২) বাদ দিলে (শেষ লোকসভা নির্বাচনে ওই দুই দল এনডিএর জোটসঙ্গী ছিল) দাঁড়ায় ১১৯। অন্যদিকে শেষ লোকসভায় এনডিএ জিতেছিল ৩৫৩ আসনে, বিজেপি একাই ৩০৩। বিজেপি যতগুলো আসনে জিতেছিল তার কমবেশি ২৫০ আসনে

এই জগাখিচুড়ি জোটের সামনে যুক্তিসঙ্গত কোন এজেন্ডা নেই। এদের লক্ষ্য একটাই। তা হলো নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা। মোদী বিরোধিতার মন্ত্রেই আগামী বছরের লোকসভায় জিতে এনারা ক্ষমতায় আসতে চায়। প্রথমত এই জোট আদৌ টিকবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন আর যদি টিকেও যায় সেক্ষেত্রেও এই জোটের পক্ষে দূরদূরান্ত পর্যন্ত ক্ষমতায় আসার কোন সম্ভাবনা নেই— অন্তত সংখ্যাতত্ত্ব এবং বাস্তবতার বিচারে।

বিজেপি একাই পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিল। পুরো এনডিএ ধরলে সংখ্যাটা প্রায় ২৮৫। গত লোকসভার বিজেপি যে রাজ্যগুলোয় ভালো ফল করেছিল (যেমন ইউপি, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি) সেখানে প্রায় সব জায়গাতেই একের বিরুদ্ধে এক ফর্মুলায় লড়েছিল বিরোধীরা। অর্থাৎ সেখানে এটা নতুন কিছু নয়। আর যে সব জায়গায় বহুমুখী লড়াইয়ে নেমেছিল বিজেপি (যেমন পশ্চিমবঙ্গ) সেখানে বিজেপির আসন বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি কারণ এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই এবং মোদী বিরোধীতায় বিরোধীরা এক লাইনে চলে যাওয়ায় রাজ্যে শাসক বিরোধী ভোট বিজেপির ঝুলিতেই যাওয়ার সম্ভাবনা।

যদিও ফলাফল পরের কথা, আগে আসন সমঝোতা। বুঝতে হবে এই জোটের একটা দলও বিজেপির মতো জোটসঙ্গীর প্রতি উদার নয়। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে মহারাষ্ট্রে যে বিধানসভা ভোট হয়েছিল তাতে বিজেপি ১২২ আসনে জিতেছিল আর তৎকালীন শিবসেনা ৬৩। তা সত্ত্বেও লোকসভায় ৪৮ আসনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক (২৩টি) আসন শিবসেনাকে ছেড়ে দেয় বিজেপি। একই উদারতা দেখা যায় বিহারেও। ২০১৪ সালের লোকসভায় বিহারে মাত্র দু'টি সিট জেতা জেডিইউকে ঊনিশের নির্বাচনে নিজের সমান (১৭টি) আসন ছেড়ে দেয় (২২ আসনে জেতা) বিজেপি। জোটসঙ্গীর প্রতি এরকম উদার কি মমতা ব্যানার্জি বা সোনিয়া গান্ধী হতে পারবেন! নির্দ্বিধায় বলা যায়, না। মমতা ব্যানার্জির দীর্ঘদিনের বাসনা প্রধানমন্ত্রী হওয়া। এখন অন্য রাজ্যে ভোটে দাঁড়ালে জামানত যাবে তৃণমূলের। এক্ষেত্রে নিজের রাজ্যে বিজেপির মত উদারতা দেখানোর জায়গায় তিনি নেই। খুব বেশি হলে হয়তো বহরমপুর বা মালদা দক্ষিণের মত কংগ্রেসের জেতা সিট কংগ্রেসকে ছাড়বেন আর সাথে দু-একটায় বিজেপির কাছে হারতে পাঠাবেন, তার বেশি কিছু নয়। রাজ্যে সব জায়গায় শূন্য হয়ে যাওয়া সিপিএমও আছে জোটে। কিন্তু শেষ নির্বাচনে একটাতেও দ্বিতীয় পর্যন্ত হতে না পারা দলকে হারতে ছাড়ার জন্য কিই বা থাকতে পারে সেটাই বড় প্রশ্ন। আরো বড় প্রশ্ন কিছুই যখন পাবে না তখন বামেরা জোটে আছে কেন! উত্তর একটাই, নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা।

অভিষেক মনু সিংভি-কপিল সিব্বলদের নিয়ে আদালতে আর সোনিয়া-ইয়েচুরি-রাহুলকে নিয়ে বিরোধী জোটমঞ্চে নাটক করা তৃণমূল স্বপ্ন দেখছে বিজেপিকে এ রাজ্যে আটকে দিয়ে নিজেদের স্বপ্ন ফেরি করার। বলার অবকাশ রাখে না সে স্বপ্ন ঘুমের মধ্যেই থেকে যাবে, বাস্তবের মুখ দেখবে না।

সংখ্যাতত্ত্বে কাঁচা সিপিএম-তৃণমূল-কংগ্রেস ভুলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি ঘুমন্ত দৈত্যের মতো অবস্থান করতো। সেই দৈত্য এখন জাগছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যে বিজেপি মাত্র দুটি সিট পেয়েছিল। ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় আঠেরোয়। ২০১৬ সালে

বিধানসভায় মাত্র তিনজন সদস্য ছিল বিজেপির। পাঁচ বছর পর ২০২১ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক সংখ্যা ৭৭। হিংসা পরিপূর্ণ পঞ্চায়েতের দিকে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ২০১৮ সালে মোট যত আসন বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েতে জিতেছিল এ বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ করে নিয়েছে তারা। অর্থাৎ পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা হয়ে লোকসভা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎবেগে উঠে আসছে ভারতীয় জনতা পার্টি। উল্টোদিকে বাম-কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে ক্লোজড চ্যাপ্টার আর তৃণমূল ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। পাঠককুল নিশ্চয়ই ভুলে যাননি আগের লোকসভায় অর্থাৎ ২০১৯ সালে তৃণমূলের স্লোগান ছিল '৪২ এ ৪২' আর বিজেপির স্লোগান ছিল 'উনিশে হাফ একুশে সাফ'। তৃণমূল তার স্লোগানের ধারেকাছে পৌঁছাতে না পারলেও পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪২টি আসনের ১৮টিতে জিতে বিজেপি তার স্লোগানের প্রথম অংশ প্রায় পুরোটাই প্রমাণ করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ একুশে সাফ তৃণমূলকে করা যায়নি।

ভোট পূর্ববর্তী নাটক, কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে নিজেদের নামে চালানো, পুলিশ-প্রশাসনকে নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করা, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অনেক জায়গায় বসিয়ে রাখা বা ভোট গণনায় কারচুপির মত বিবিধ কারণের

পাশাপাশি একুশে তৃণমূলের জয়ের একটা অন্যতম কারণ বাম এবং কংগ্রেসের দ্বারা তাদের একটা বড় অংশের ভোটারকে ভুল বুঝিয়ে তৃণমূলের দিকে ঠেলে দেওয়া। ভোটের হিসাবে তাই দেখা যাচ্ছে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সাপেক্ষে ২০২১ সালের বিধানসভায় বিজেপির ভোট মাত্র আড়াই শতাংশ কমলেও তৃণমূলের ভোট বেড়ে গিয়েছে পাঁচ শতাংশের উপরে। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় নিজেদের আসন সংখ্যা শূন্য করে দিয়ে এই অতিরিক্ত ভোট তৃণমূলের দিকে পাঠিয়েছে সিপিএম-কংগ্রেস। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার বাম কংগ্রেসের এই নোংরা এবং অনৈতিক খেলার মূলত তিনটি উপাদান ছিল। প্রথম 'নো ভোট টু বিজেপি', দ্বিতীয় 'সেটিং থিওরি' এবং তৃতীয় 'বাঙালি বিদ্বেষী বিজেপি'।

মানুষকে বোঝানো হয়েছিল 'নো ভোট টু বিজেপি' একটি সামাজিক স্লোগান। অরাজনৈতিক ব্যানারে তৈরি তৃণমূলের পোষ্য সংগঠনের সর্বময় কর্তা সামিরুল ইসলাম ছিলেন এই স্লোগানের জনক। সামিরুল ইসলাম বামঘেঁষা অধ্যাপক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন তখন। তাঁর সংগঠনের নেতৃত্বে কিছু বামমনস্ক আপাত অরাজনৈতিক মানুষ এবং তৃণমূলের দৌলতে সরকারি কোষাগার থেকে বেআইনিভাবে মাইনে পাওয়া কিছু বাম ঘেঁষা বুদ্ধিজীবী (যাঁরা সিলেক্টিভ প্রোপাগান্ডাতে বিশ্বাসী এবং তৃণমূলের শত অন্যায় এবং দুর্নীতি তাঁরা দেখেও দেখেন না) জোরদার প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন এই স্লোগান নিয়ে। ভোটের আগে এমনকি ভোটের পরেও অনেকেই বুঝতে পারেননি যে এই পুরো ক্যাম্পেনটাই ছিল পরোক্ষে তৃণমূলের ফান্ডিং করা। ফলে কিছু ভন্ড বুদ্ধিজীবী এবং তৃণমূলের পরোক্ষ ফান্ডিংয়ে চলা (অ)সামাজিক সংগঠনগুলোকে বিশ্বাস করে ফেলে মানুষ। যার মধ্যে সিপিএমের অত্যাচার ও অন্যায়ের শিকার নিরীহ কিছু বাম সমর্থকও ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বামপন্থী বা বিজেপিপন্থী শিক্ষিত মানুষজনের অনেকেও এই খেলা প্রথমে ধরতে পারে নি। পরে যখন বোঝা গেল এটা তৃণমূল তথা মমতা ব্যানার্জির কূটবুদ্ধির ফসল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইন্টারেস্টিং তথ্য হল বাম ঘেঁষা এই সামিরুল ইসলামকে নিজেদের টিকিটে এবারে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে তৃণমূল। অর্থাৎ প্রকাশ্য স্বীকৃতি। তৃণমূল মেনে নিয়েছে বামেদের ব্যবহার করে এই প্রোপাগান্ডামূলক প্রচার চালিয়েছে তারাই।

এরপর 'সেটিং থিওরি'। সেটিং থিওরির ধারক ও বাহক অর্থজীবী কিছু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে বুথ স্তর পর্যন্ত ক্রমাগত 'মোদী এবং দিদির সেটিং' নিয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব দিয়ে যাচ্ছে। যদিও বিজেপির ভোট কাটার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি এই তত্ত্বের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেটিং থিওরি উস্কে দেওয়ার জন্য তিনি মাঝে মাঝেই বলে দেন 'মোদী খারাপ নয়, অমিত শাহ খারাপ' বা 'বিজেপির সবাই খারাপ না' জাতীয় কথা। সাথে সাথেই সেটিং থিওরি প্রচার করতে উঠে পড়ে লাগে মিডিয়া থেকে তৃণমূলের পোষা 'থিওরি বাহিনী'। খেয়াল করলে দেখা যাবে বিজেপির তরফ থেকে শীর্ষনেতৃত্ব কোনোদিন এরকম কথা বলেন না, কারণ বিজেপি বিশ্বাস করে পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব তাদেরই। পাশাপাশি ইডি বা সিবিআই ভাইপো বা তৃণমূলের বড় কোনো মুখকে ডাকলেই মমতা ব্যানার্জি দিল্লি চলে যান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের অজুহাতে (প্রধানমন্ত্রী সময় না দিলে অন্য কেউই সই, তবু যান)। পিওরলি প্রশাসনিক এই মিটিংয়ের পর না আটকায় হাজিরা আর না আটকায় গ্রেপ্তার (অনুব্রত থেকে পার্থ এর প্রমাণ, এমনকি ভাইপোর ডাকও আটকায় নি)। শুধু মাঝখান থেকে বাম-তৃণমূল-কংগ্রেসের সম্মিলিত সেটিং থিওরির প্রচারকরা মানুষের মনে এই ধারণা গেঁথে দেয় আরো তীব্রভাবে। একটু চোখ খোলা রাখলেই দেখা যাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতায় রাজ্যের এজেন্সি বিজেপির কারুর ক্ষতি করার উদ্যোগ নিলে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব তৃণমূলনেত্রীর সাথে মিটিংয়ের নূন্যতম চেষ্টা করে না, উল্টে তার রাজনৈতিক মোকাবিলা করে। একইভাবে দেখা যায় মমতা ব্যানার্জি মাঝেমধ্যেই ফল বা পোশাক পাঠিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রীকে (এবং সেটা মিডিয়াকে জানিয়ে), যদিও প্রশাসনিক সৌজন্য ছাড়া উল্টোদিক থেকে কিছু ফেরত আসে না। 'সেটিং' প্রমাণ করার এই মিথ্যে প্রচেষ্টা থেকেই মাঝে মধ্যেই মিডিয়ার সামনে রাজ্যসভায় ভোট বয়কটের নাটক করে তৃণমূল। দেখা যাচ্ছে তৃণমূল যে সব ক্ষেত্রে রাজ্যসভায় ভোট বয়কট করে সেগুলোর প্রায় সবগুলোতেই তৃণমূল বিপক্ষে ভোট দিলেও এনডিএ জিতে যেত। অর্থাৎ তৃণমূলের রাজ্যসভা বয়কটে বিজেপির কোনো লাভ হয় না। যেটুকু লাভ হয় সেটা তৃণমূলের, সেটিং থিওরি দ্বারা বিজেপির ভোট কেটে। আবার অন্যদিকে কেন্দ্র থেকে মোট প্রাপ্তকরের ৪২ শতাংশ আনুপাতিক হারে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর। বিজেপি-কংগ্রেস বা সিপিএম শাসিত রাজ্যের ন্যায় তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সেই অর্থ পেয়ে থাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে। মিডিয়া বা সেটিং থিওরির ধারক বাহকেরা সেটা নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করে নিজেদের তত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা

করে। তারা ভুলে যায় কেন্দ্রীয় করের ভাগ সব রাজ্যই পায়। তারা এটাও ভুলে যায় দুর্নীতির অভিযোগের সবথেকে বেশি তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা কোনো রাজ্যে করে থাকলে সেটার নাম পশ্চিমবঙ্গ।

তবে সেটিং অবশ্যই এরাজ্যে আছে এবং সেটা সিপিএমের সাথে তৃণমূলের। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিপিএম বুঝে গিয়েছিল আগামী অন্তত ২৫ বছর এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না এবং ততদিনে হয়তো তারা রাজনৈতিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তখন থেকেই গোপনে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করতে থাকে তারা। নবান্নের ফিসফ্রাই থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে চায়ের আড্ডাতে এই জোটের গাড়ি নীরবে এগিয়ে চলতে থাকে। এতদিন তা গোপনে হচ্ছিল আজ পঞ্চায়েত ভোটের বুথ স্তর থেকে ধর্মতলা হয়ে পাটনা-ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত সিপিএম-কংগ্রেসের সাথে তৃণমূলের এই সেটিং প্রকাশ্যে এসেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ বুঝতে পারছে তৃণমূলের অপশাসন থেকে রাজ্যকে মুক্ত করার এক এবং একমাত্র অবলম্বন ভারতীয় জনতা পার্টি।

তৃণমূলকে জেতাতে উনিশের লোকসভা আর একুশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ও তার দোসর সিপিএম তথা কংগ্রেসের এক অন্যতম প্রচার কৌশল ছিল বিজেপিকে বাঙালি বিদ্বেষী প্রমাণ করা। দুর্ভাগ্য বাঙালির, চিনের বন্ধু সিপিএম আর ইতালিয়ান ম্যাডামের কংগ্রেসের কাছে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি হবার প্রমাণ দিতে হচ্ছে বিজেপিকে। সেই বিজেপি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাদের যেকোনো পার্টি অফিসে গেলে অন্তত দুটো ছবি দেখা যাবেই যাবে— শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যদিকে কংগ্রেসের পার্টি অফিসে তার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির ছবিই থাকে না। আর সিপিএমের পার্টি অফিস তো পুরো বিলেতযাত্রা। কার্ল মার্ক থেকে এঙ্গেলস সবাই থাকলেও কোন বাঙালি দূর অস্ত, ভারতীয়েরও সেখানে স্থান হয় না। রইলো বাকি তৃণমূল। মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি ছাড়া কোন বাঙালির জায়গা তাদের পার্টি অফিসে আজ অব্দি হয়নি। সিপিএম যাঁকে 'তেজোর কুকুর' বলেছিল আর জেতার পরেও যাঁকে কংগ্রেস সভাপতি হতে দেয়নি সেই নেতাজিকে বা ঋষি অরবিন্দকে বা স্বামী বিবেকানন্দকে সর্বাধিক সম্মান কোনো দল দিয়ে থাকলে সেটা বিজেপি— অন্য কেউ নয়।

আমরা কি ভুলতে পারবো ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট চলাকালীন বিদ্যাসাগর কলেজে মহামানবের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা! কোন এক জাদুবলে ঘটনার দশ মিনিটের মধ্যে মাননীয়া এসে মূর্তির ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে বুকে জড়িয়ে নাটক শুরু করে দেন। ধীরে ধীরে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যায় বিজেপিকে বাঙালিবিদ্বেষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ওই ঘটনা তৃণমূলই ঘটিয়েছিল। তাই আজও এ ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট জানা যায় না। আর এই ঘটনার সাথে জড়িতরা তৃণমূলনেত্রীর দয়ায় বড় বড় পদে আসীন। ভুললে চলবে না বিদ্যাসাগরের ব্রোঞ্জের নতুন মূর্তি যিনি দিয়েছিলেন তাঁর নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভোটে জেতার জন্য বাঙালির সবথেকে বড় ক্ষতি দিনের পর দিন যিনি করে চলেছেন তিনি স্বয়ং তৃণমূলনেত্রী।

সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের এই অনৈতিক জোট আগামী নির্বাচনে সম্মিলিতভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে একজনের ভোট সুবিধামতো অন্যজনকে ট্রান্সফার করে এ রাজ্যে ভালো ফল করার। যেহেতু দুর্জনের ছলের অভাব হয় না তাই 'নো ভোট টু বিজেপি' বা 'সেটিং থিওরি' বা চোট পাওয়ার মত নাটুকে কোন পদক্ষেপের মতো অনেক কিছুই করতে পারে এই রাক্ষুসে মহাঘোঁট। মহাভারতে যেমন পাণ্ডবদের পরাজিত করতে অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজারা এক হয়েছিল কৌরবদের নেতৃত্বে, তেমনি আগামী লোকসভার মহারণে তৃণমূলের নেতৃত্বে একজোট হয়েছে জনগণবিরোধী শক্তিগুলো। মহাভারতের কৌরব জোটের ন্যায় এরাও বিভিন্ন কূট এবং অধর্মের হাতিয়ার প্রয়োগ করবে বিজেপির বিপক্ষে। মিথ্যেভাবে প্রচার করা হবে বাম-কংগ্রেস আসলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কিন্তু দেশের স্বার্থে আপাতত বিজেপির বিপক্ষে। কোন স্বার্থ? উত্তরে কিছু পোষা বুদ্ধিজীবী আর কেনা মিডিয়াকে দিয়ে সব গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে ওরা। বুঝে নিতে হবে ক্ষমতা দখল আর দেশবিরোধীতা ওদের একমাত্র স্বার্থ। বা হয়তো বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে উগ্র রাষ্ট্রবিরোধিতার পালে হাওয়া দেবে ওরা, তৃণমূলের সহায়তায় - বিপদে ফেলে দেওয়া হবে পঞ্চাশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে যারা বাংলায় কাজ না পেয়ে অন্য রাজ্যে গেছে ভাগ্যের সন্ধানে। বা হয়তো অন্য নতুন কোনো অনৈতিক ফন্দি আঁটবে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের মহাঘোঁট। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে থাকলেও যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সহজ হয়নি পাণ্ডবদের জন্য এবং তাই পদে পদে সচেতন থেকে প্রাণপন লড়াই দিতে হয়েছিল কুন্তিপুত্রদের তেমনি এখানেও বিজেপি কর্মীদের প্রতি পদে চোখ কান খোলা রেখে মাটি কামড়ে লড়াই দিতে হবে দেশের স্বার্থে - বাংলার স্বার্থে। যে লড়াই দিতে জানে বাংলার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। জয়ের শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তিনদিনেই ধূলিসাৎ বিরোধী জোট

জয়ন্ত গুহ

সংসদে দাঁড়িয়ে মণিপুরে শান্তির আশ্বাস এবং দেশের উন্নয়ন নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যয় গোটা দেশকে এক অটুট আস্থা এবং বিশ্বাসে বেঁধে দিয়েছে। বিরোধী জোটের পাল্টা রাজনৈতিক আক্রমণ দূরের কথা। উঠে দাঁড়াতে পারবে তো? স্বার্থপর, নির্লজ্জ এই বিরোধী জোটকে ভোট দেওয়ার কথা আদৌ ভাববে একজন ভারতীয় নাগরিক?

প্রায় খুঁচিয়ে তোলা অনাস্থা বিতর্কে লোকসভায় নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই জব্দ বিরোধী জোট। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগেই মোদী-শাহর সার্জিকাল স্ট্রাইকে সংসদে মুখ থুবড়ে পড়ল সনিয়া-রাহুল কংগ্রেসের হাসজাড়ু জোট। মুখ থুবড়ে পড়ল গান্ধী পরিবারের পরিবারবাদ, দরবারবাদ এবং কংগ্রেসের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। বসে বসে নিজেদের পরাজয় চওড়া করা ছাড়া সংসদে তখন আর কিছুই করার ছিলনা কংগ্রেসের এবং বিরোধী জোটের। অগত্যা ধীরে ধীরে পিঠটান। রীতিমত সংসদ ছেড়ে পালিয়ে গেল গান্ধী পরিবার ও তাঁদের বহু সাধের বিরোধী জোট।

ডুবে যাওয়ার আগে মানুষ যেমন বাঁচার জন্য খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরে ঠিক তেমনই 'মণিপুর মণিপুর' স্লোগান তুলে প্রধানমন্ত্রীর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল এবং নিজেদের মুখরক্ষা করতে চেয়েছিল বিরোধীরা। সেটুকুও অনাস্থা বিতর্কের দিন কেড়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু কেড়েই নিলেন না, খড়কুটোর মতই উড়িয়ে দিলেন মণিপুর নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী জোটের মিথ্যা দরদ। নোংরা রাজনীতি।

অবাক করার মত বিষয় একটাই। রাজনৈতিক আক্রমনের মুখে যখন বালির বাঁধের মত উড়ে যাবে অনাস্থা প্রস্তাব তাহলে সেই প্রস্তাব সংসদে এনেছিল কেন বিরোধীরা? ভোটাভুটিতে হারবে সে তো সবাই জানতো। তাহলে! সংসদে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীকে গালমন্দ করার জন্য?

রাহুল বললেন 'রাবন', অধীর চৌধুরী বললেন 'নীরব মোদী'। সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন দেশেরই দুই সাংসদ। অথচ তাঁদেরই আনা অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁরা সরকারকে যুক্তি তথ্য দিয়ে বিপাকে তো ফেলতে পারলই না। উল্টে তৈরি না হয়ে আসায় বিতর্কের নামে মধ্যবয়সী বদমেজাজে অশ্বডিম্ব প্রসব করল। কিন্তু কেন?

২৬টি রাজনৈতিক দল নিয়ে বিরোধী জোটের তাহলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা রণকৌশল ছিল না? তাহলে কি কোন 'অদৃশ্য চাপে' বিরোধীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গালমন্দ করা এবং মণিপুর নিয়ে কোন গঠনমূলক সমাধান সূত্র না দিয়ে মণিপুরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে দেশের মধ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা?

সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবে কখনই একটি মাত্র বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না। বিরোধী দল মণিপুরের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও আলোচনায় আনতে

পারত কিন্তু হট্টগোল এবং কটু শব্দ প্রয়োগ ছাড়া সংসদে একজন সাংসদের ভূমিকার কথা সম্ভবত তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে এনডিএ-কে তাঁরা ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দিল।

অনাস্থা খণ্ডন করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ প্রায় সকলেই কংগ্রেসকে তুলোধুনো করার পাশাপাশি তুলে ধরেছে মোদী সরকারের ৯ বছরের সাফল্য। সরকারের পক্ষ থেকে বিজেপির ১৫ জন বক্তা সুকৌশলে সংসদের অনাস্থা বিতর্ককে সুপরিকল্পিত ভাবে বিজেপি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের এজেন্ডায় পরিণত করে দিয়েছে। বিরোধী জোটের ডাকা অনাস্থা বিতর্কই সরকার পক্ষকে এই সুবিধা করে দিল। তার জন্য অবশ্য হাসতে হাসতে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদও জানিয়েছেন বিরোধী জোটকে।

অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সংসদে ১০ আগস্ট যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হল—

১. বিরোধীরা ভারতের মঙ্গল দেখতে পারে না।
২. ভারতে দুঃখদারিদ্র থাকলেই এদের 'দোকান' চলে।
৩. দোকানের নাম পাল্টে পাল্টে একই বস্তা পচা গরীবি, অসহায়তা এবং লজ্জা বিক্রি করে এরা।
৪. এরা যখন যাকে গালি দিয়েছে তারই ভাল হয়েছে। ওরা গালি দিচ্ছে বলেই দেশের ভাল হবে, আমাদের ও ভাল হবে।
৫. ২০১৮ অনাস্থা ভোটের পর আমরা ৩১৩ হয়েছিলাম। ২০২৩ অনাস্থা ভোটের পর আমরা ৩৫০ পার করবো।
৬. এরা আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে কিন্তু ভুলে গেছে যে এদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের অনাস্থা প্রকাশ করেছে গত কয়েক দশক ধরে।
৭. তামিলনাড়ুতে গত ৬৮ বছর ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের অনাস্থা। পশ্চিমবঙ্গে গত ৫৬ বছর ধরে, উত্তর প্রদেশে গত ৩৯ বছর ধরে, ওড়িশায় গত ২৮ বছর ধরে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বিগত ২০ বছর ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়েছে সেখানকার জনগণ।
৮. নাম, পতাকা, চিহ্ন, মতাদর্শ- সবকিছুতেই কংগ্রেস চুরি করেছে।
৯. বিজেপি সরকারের তৃতীয় দফায়, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত।
১০. দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং স্বজনপোষণ ছাড়া বিরোধীদের ভারতকে দেওয়ার মত কিছু নেই।

ততক্ষনে কংগ্রেস এবং তাঁদের বকচ্ছপ জোট বুঝে গেছে কি ভুল তাঁরা করেছে। অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবী ভাষণে প্রধানমন্ত্রীকে তো বলতে দিতেই হবে। কিন্তু বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধী জোটকে নিয়ে তীব্র আক্রমণ করছেন বা ঠাট্টা তামাশা করছেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে ক্লান্ত হয়ে অধিকাংশ সাংসদ যখন বেরিয়ে গেছে, উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে তখনই কংগ্রেসকে সবচেয়ে বড় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা দেশের চোখ কিন্তু তখন টেলিভিশনের পর্দায়। এরপর প্রধানমন্ত্রী যা বললেন, তা শুনলে অনেকেরই হয়তো অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।

স্বাধীন ভারতে ৫ মার্চ ১৯৬৬ মিজোরামে অসহায় নাগরিকদের ওপর কংগ্রেস সরকার বায়ুসেনাকে বোমাবর্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। নিজের দেশেই বায়ুসেনাকে দিয়ে এই হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। যদিও সেই মর্মান্তিক ঘটনা বহুদিন দেশের জনগণের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল কংগ্রেস পার্টি। মিজোরাম কিন্তু ভোলেনি, আজও মিজোরামে সেই ঘটনার স্মরনে প্রতিবছর শোকপালন করা হয়। কংগ্রেস কিন্তু কখনও সেই ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেনি। 'উত্তর-পূর্বের মিজোরামবাসীরা কি আমার দেশের নাগরিক ছিল না? তাঁদের সুরক্ষার দায় ছিলনা তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের?' —সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। গান্ধী পরিবার, কংগ্রেস এবং বিরোধী জোট তখন সংসদ ছেড়ে দে ছুট, দে ছুট।

এরপর নরেন্দ্র মোদী যা বলছেন তা আরও সাংঘাতিক। ১৯৬২ সাল। ভারতে হামলা করেছে চিন। বমডিলা পার করে প্রায় আসামের কাছে চলে এসেছে চিনা সেনা। গোটা দেশের সঙ্গে আসামের মানুষেরও একমাত্র ভরসা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ভারত সরকার। সেই সময় কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রেডিও ভাষণে, আসামের মানুষকে তাঁদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'মাই হার্ট গোস টু আসাম' —মানে চিনা আক্রমনের বিরুদ্ধে আসামকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়াননি নেহরু। 'এই ঘটনা আজও ত্রিশূলের মত বিঁধছে উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের বুকে' —সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ইতিহাস সেটাই বলে।

কৃতজ্ঞতা: সংসদ টিভি

১০ আগস্ট বিকেল ৫টা ৭ মিনিটে অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবী ভাষণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে শেষ হয় তাঁর ভাষণ। একটা সময় বিরোধী জোটের সাংসদরা সংসদ থেকে ওয়াক-আউট করে। রীতিমত পালিয়ে যায়। কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আগামীদিনে বিরোধী জোটকে কিন্তু উত্তর দিতে হবে দেশের জনগণের কাছে। উত্তর দিতে হবে, 'মৈরাংয়ে যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে বোমা ছোড়া হয়েছিল, তখন মণিপুরে কোন দলের সরকার ছিল?' কেন রাম মনোহর লোহিয়া বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন করছেন না' নেহরু?

'২০১৮ সালে যখন অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল, তখন ভোটাভুটির সময় বিরোধীদের হাতে যতজন সাংসদ ছিলেন, ততগুলি ভোটও জোগাড় করতে পারেনি। জনতার কাছে যেতে জনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জারি করে দিয়েছিল। বিপক্ষের অনাস্থা প্রস্তাব আমাদের জন্য শুভ। আজ আমি দেখলাম যে আপনারা ঠিক করে নিয়েছেন, সব রেকর্ড ভেঙে ২০২৪ সালে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি ও এনডিএ জোট।' —মণিপুরে শান্তির আশ্বাস দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর এই প্রত্যয় গোটা দেশকে এক অটুট আস্থা এবং বিশ্বাসে বেঁধে দিয়েছে। বিরোধী জোটের পাল্টা রাজনৈতিক আক্রমণ দূরের কথা। উঠে দাঁড়াতে পারবে তো? স্বার্থপর, নির্লজ্জ এই বিরোধী জোটকে ভোট দেওয়ার কথা আদৌ ভাববে একজন ভারতীয় নাগরিক?

স্বাধীনতার ৭৬তম বার্ষিকীতে

নরেন্দ্র মোদীর শ্রেষ্ঠ ভারত

বিনয়ভূষণ দাশ

২০৪৭ সালে দেশে স্বাধীনতার শতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য রেখে নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের জুলাইয়ে, অমৃতকালের নাম রেখেছিলেন কর্তব্যকাল। ৯ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নতুন ভারত নির্মাণের পরবর্তী ধাপ কর্তব্যকালের মূল লক্ষ্য আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নকে শিখরচূড়ায় পৌঁছে দেওয়া। কর্তব্যের মাধ্যমেই নির্মাণ হবে স্বপ্নশিখর —এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত।

২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী মহা আড়ম্বরে পালিত হয়েছিল অমৃতকাল উদযাপনের মধ্য দিয়ে। ২০৪৭ সাল দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০২২ থেকে ২০৪৭ সাল, এই ২৫ বছর দেশের কর্তব্যকাল। নরেন্দ্র মোদী সরকারের দেশসেবার ৯টি বছর অমৃতকাল পেরিয়ে এবার কর্তব্য পথে। দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্তব্যকালের লক্ষ্য। যে কাজ শুরু হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সময়, আজ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার ৭৬তম বার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্নশিখরকে স্পর্শ করতে চলেছে নতুন ভারত।

দেশের পুনর্গঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি, ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'The gigantic task of reconstruction—cultural, social, economic and political can be rendered possible through coordinated efforts of bands of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of India's past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can place before their country a programme of work, which while loyal to the fundamental traditions of Indian civilization will be adapted to the changing conditions of modern world.' তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল তাঁর আরব্ধ সেই কাজই তন, মন, ধন দিয়ে এক নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে গত নয় বৎসর ধরে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রগতির সঙ্গে সমন্বয় করে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে সেই কাজ করে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শ্রী মোদীর নেতৃত্বে এই সরকার দেশের মানুষের জীবনধারণের মানোন্নয়নে সতত নিয়োজিত। এই সরকার গত ৩০শে মে, '২৩ নয় বৎসরের শাসনকাল পূর্ণ করেছে। দেশের মানুষকে এই সরকার উপহার দিয়েছে সর্বোত্তম সেবা, সুশাসন এবং সাধারণ মানুষকে দিয়েছে বহু কল্যাণকারী প্রকল্পসমূহ। ফলে সমস্ত পৃথিবী আজ একবাক্যে স্বীকার করছে, একুশ শতক ভারতের শতক। গত নয় বৎসরে 'নীতিপঙ্গুত্ব' থেকে, সিদ্ধান্তহীনতা থেকে আমাদের দেশ দৃঢ়নিশ্চয়

হয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আমাদের দেশকে 'ভঙ্গুর পাঁচ' অর্থনীতির দেশ থেকে 'শীর্ষ পাঁচ' অর্থনৈতিক দেশের মধ্যে উন্নীত করেছে। গত নয় বৎসরে ভারতের নাগরিকগণ 'এক পরিবার ও তার উন্নয়নের' নীতিকে পরিত্যাগ করেছে, পরিবর্তে তাঁরা 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিকে গ্রহণ করেছে। জাতিবাদ, পরিবারতন্ত্র, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি এবং তোষণের রাজনীতি আজ পরিত্যক্ত; পরিবর্তে আজ উন্নয়ন, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের শাসনতন্ত্রে। নেহরুর 'অনুন্নত দেশের' তকমা ঝেড়ে ফেলে ভারত আজ 'Developed country' তে উন্নীত হতে চলেছে।

মানুষের মূলগত চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎসংযোগ ইত্যাদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যে কোন সভ্য সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য। অথচ, দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে এই কাজগুলিই হচ্ছিল না। অর্থনীতিবিদ অর্থমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে তার প্রধানমন্ত্রীত্বকালেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সুগম করেছেন। দেশের নাগরিকদের প্রাথমিক প্রয়োজন যে অন্ন, গৃহ এবং শৌচাগার সেটাও দীর্ঘ কংগ্রেসি রাজত্বে কেউ অনুভব করতে পারেনি। ভয়ঙ্কর করোনা কবলিত বিশ্বকে করোনামুক্ত করতে মোদীজি নেতৃত্বদান করেছেন। মোদীজীর রাজত্বে ব্যবস্থা করা হয়েছে সকলের গৃহের, ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বাস্থসম্মত শৌচাগারের। যাইহোক, মোদী সরকারের বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্পগুলি, সামাজিক বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বহুচর্চিত। তাই সেগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। যে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি দেশের পূর্বতন কংগ্রেস ও নানা রঙের জোট সরকারগুলি ভুলে থেকেছে বা অবহেলা করেছে বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির কয়েকটি তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে এই নয় বৎসরে মোদী সরকার আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের দেশে আক্রমণকারীরা বারে বারে আক্রমণ করে এই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি ধ্বংস করেছে। ভারতের আত্মা বিষণ্ণ হয়েছে বারে বারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাই হোলকার ভারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরসমূহ ও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবার পুনঃস্থাপিত করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ভারতের স্বাভিমান পুনর্জাগরিত করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মস্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। কেদারনাথ, কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরগুলি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ঠিক তেমনই স্বাধীনতার পরে ভারতেরও ওই সমস্ত পরাধীনতার চিহ্নমুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সোমনাথ ছাড়া অন্য কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হয়নি তথাকথিত 'সেকুলার' সরকারের আমলে। হিন্দুদের আত্মসম্মানে আঘাত হানা ও সংখ্যালঘু তোষণই হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সেকুলারপন্থীদের' একমাত্র ' আইডেন্টিটি'। পক্ষপাতহীন উন্নয়নের সাথে সাথে মোদীজি ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের কাজটিও করে যাচ্ছেন অবিচলিতভাবে। তিনি মহারানী অহল্যাবাই হোলকারের অসমাপ্ত কাজটিই করে চলেছেন। তিনি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে শ্রীরামের এক অনিন্দ্যসুন্দর মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন ৫ আগস্ট ২০২০ এ। আশা করা যায়, মন্দিরের উদ্বোধন ২০২৪এ হয়ে যাবে। পুরো অযোধ্যা শহরটাই একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হবে। বারানসীতে 'কাশী বিশ্বনাথ করিডর' চালু করাও ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত, ২৪০০ বছরের পুরনো শারদাপীঠ ৭০ বছর পরে আবার দর্শনার্থীদের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে পূজাপাঠ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় ৫০০ বৎসর পরে গুজরাতের মহাকালী মন্দিরে ধ্বজোত্তোলন করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিদেশ প্রবাসকালেও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে থাকেন। এই সুত্রেই তিনি জাপানের তোজী বৌদ্ধমন্দির, কিঙ্কাকু মন্দির, মরিশাশের শিবমন্দির, শ্রীলঙ্কার নগুলেস্বম মন্দির, মহাবোধি মন্দির, কানাডার বিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গুরুদ্বারা খালসা দিওয়ান, বাংলাদেশের ঢাকার রমনা কালীমন্দির, নেপালের পশুপতিনাথ মন্দির ও জনকপুরের সীতামায়ের মন্দির। এমনকি আরবের বিভিন্ন দেশের নানা মন্দিরে তিনি পূজা দিয়েছেন। পূর্বের ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষেত্রে যা ছিল অকল্পনীয়। প্রধানমন্ত্রী ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনকে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি সন্ত রবিদাসের পবিত্র জন্মস্থান দর্শন করে সেখানে পূজা দিয়েছেন। যোগ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রচার ও প্রসারেও তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয় সমগ্র বিশ্বে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশ থেকে চুরি যাওয়া 'ঐতিহ্যচিহ্নগুলি' ফিরিয়ে আনায় তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। এ ছাড়াও ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচার ও সংরক্ষণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আমার মতে, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ আইন, ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা রদ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন; ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশের পুনর্গঠনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও

প্রাচীন ঐতিহ্যের সমন্বয় করে এক সার্বিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন বারংবার। শ্রীনরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত নয় বৎসর ধরে সেই ভূমিকাই পালন করে চলেছে তারই প্রতিষ্ঠিত দল।

তবে এখানেই শেষ নয়। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অমৃতকাল থেকে কর্তব্যকালের পথে। কর্তব্য পালনে দেশকে সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় নিয়ে যেতে কর্তব্যকালে নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শ, জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবী জুড়ে যে সঙ্কট তার সমাধান সূত্র খুঁজে বার করা আমাদের কর্তব্য। অত্যধিক রাসায়নিক ব্যবহারে বিষিয়ে যাচ্ছে পরিবেশের জীবনতন্ত্র। ধরিত্রী মাকে বাঁচাতে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে সরকারের সঙ্গে নিরলস কর্তব্য পালন করতে হবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর বাস্তবায়ন করতে নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। সব রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে 'এক ভারত' নির্মাণ। দেশের ইতিহাস জানাতে হবে তরুণ সম্প্রদায়কে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, নরেন্দ্র মোদী বলছে, স্বাধীনতার শতবর্ষের আগে যে ২৫ বছর কর্তব্যকাল সেই সময়ে রাজনীতির কথা মাথা থেকে সরিয়ে সমাজের জন্য কর্তব্য পালন করতে হবে। এমনকি যারা আমাদের ভোট দেয়না তাঁদের সুখসুবিধার জন্যও আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের স্বার্থে।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মোদী সরকারের বিদেশ নীতি

বিমল শঙ্কর নন্দ

অতীতে ভারতের বিদেশনীতি ছিল কোন একটি বৃহৎ শক্তি নির্ভর। কখনও সোভিয়েত রাশিয়া, কখনও চিন বা আমেরিকা। ২০১৪-র পর বদলে গেছে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতের উন্নয়ন এবং বিশ্বের উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কূটনীতির মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সমদূরত্ব ও সম্পর্ক রক্ষাই নতুন ভারতের বিদেশনীতি।

যাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিদেশনীতি নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা মনে করেন যে বিদেশ নীতি হল একটি রাষ্ট্র পরিচালনার এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করে সঠিক উপায়ে বিদেশনীতি পরিচালনার উপর। বিদেশ নীতি প্রণয়ন এবং রূপায়নে ভুল হলে একটি রাষ্ট্রকে বহুদিন ধরে তার খেসারত দিতে হতে পারে। যেমন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চিন সম্পর্কে যে ভুল নীতি অনুসরণ করেছিলেন তার মূল্য ভারতকে আজও চোকাতে হচ্ছে। একই কথা প্রযোজ্য নেহেরুর পাকিস্তান ও কাশ্মীর নীতি প্রসঙ্গেও। পররাষ্ট্র নীতি বা বিদেশনীতি সম্পর্কে আর একটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির অস্থিতিশীলতা। সাধারণত আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরিত্রটাই অস্থিতিশীল। এই অস্থিতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যখন যুদ্ধ বা অন্য কোনও কারণে বিশ্বজোড়া সংকটের সৃষ্টি হয়। তখন রাষ্ট্রের বিদেশনীতি বড় পরীক্ষার সামনে পড়ে যায়। বিশেষত সেই সমস্ত রাষ্ট্র যারা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিংবা প্রত্যাশা করে। দক্ষ হাতে বিদেশনীতি পরিচালনা করলেই কেবল এই সংকটের মোকাবিলা করা যায়।

৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ৫২৯ দিনে প্রবেশ করেছে। অবশ্য অনেকেই মনে করেন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত প্রকৃতপক্ষে প্রায় সাড়ে নয় বছরের পুরনো। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় যখন রুশ মদতপুষ্ট যোদ্ধারা ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত ক্রিমিয়া এবং ডনবাসের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। এই অপেক্ষাকৃত সীমিত এবং একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ যুদ্ধ এক পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের রূপ নেয় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর

এর প্রতিক্রিয়াও হয় মারাত্মক। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের বিদেশনীতির উপরও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

ভারত যেহেতু বিশ্ব রাজনীতিকে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ actor বা ভূমিকা পালনকারী তাই আন্তর্জাতিক সংকটের সময় তাকে অনেক সতর্কতার সঙ্গে নীতি নির্ধারণ করতে হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের প্রাথমিক সূত্রপাত ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, আর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ সরকার ক্ষমতায় আসে ২০১৪ সালের মে মাসে, ফলে প্রথম থেকেই মোদী সরকারকে রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। ২০১৪ সালে রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া দখলের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করতে শুরু করে। এই ব্যবস্থায় সামিল হওয়ার জন্য ভারতের উপরও চাপ বাড়তে থাকে। বিশেষত ২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এই চাপ আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ভারতের পক্ষে এটা ছিল উভয় সংকটের পরিস্থিতি। একদিকে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভারত মার্কিন সম্পর্ক দ্রুত উন্নত হতে থাকে। এশিয়া এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী নীতির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে তার উপস্থিতি বৃদ্ধি করার দিকে নজর দেয়। ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চীনের আগ্রাসী মনোভাবকে প্রতিহত করতে ভারতও এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিকে সংহত করার উদ্যোগ নেয়। ২০০৭ সালে গড়ে ওঠা QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) যা ২০০৮ সালে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল তাকে ২০১৭ সালে নতুন করে সক্রিয় করা হয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র QUAD-কে কেন্দ্র করে এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা আরও জোরদার করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই বাস্তব অবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা কিংবা একে অস্বীকার করা ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এটা যদি বাস্তববাদী রাজনীতির একটা ছবি হয় তবে অন্য দিকটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ছিল তখন থেকেই দু-দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারত বিপদের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পেয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর তার প্রধান উত্তরসূরী রাশিয়া আন্তর্জাতিক নীতিতে নানা ধরনের বদল আনলেও ভারত রাশিয়া সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই থেকে গেছে। ২০১৪ সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের একটি জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী ৮৫ শতাংশ রাশিয়ানই ভারত সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন, ভারতকে বন্ধু বলে মনে করেন, মাত্র ৯ শতাংশের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নেতিবাচক। ২০১২ থেকে ২০১৬ —এই সময়কালে ভারতে প্রতিরক্ষা আমদানির ৬৮ শতাংশই আসত রাশিয়া থেকে। ২০১৬-১৭-এর পর থেকেই ভারতে রাশিয়ার অস্ত্র রপ্তানী কমতে থাকে। ২০১৮-২২ এর সময়কালে তা হয়ে যায় ৪৫ শতাংশ। যাই হোক নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার যখন রুশ-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করছিল তখন তাকে ভারত-রাশিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টিকে মাথায় রাখতে হয়েছিল। দু-দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানও ছিল যথেষ্ট পরিমানের। ২০১২ সালের হিসেবে ভারত-রাশিয়া মোট বাণিজ্যের পরিমান ছিল ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্যের পরিমান ক্রমেই বাড়ছিল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার তার গৃহীত নীতিতে ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার উপরেই বেশি গুরুত্ব দেয়। আমেরিকা এবং তার সহযোগীদের স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয় যে রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা কিংবা বাণিজ্যিক কোনও সম্পর্কই বন্ধ করা সম্ভব নয়। ভারত এটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে ভারত যে কোনও ধরনের আগ্রাসনের বিরোধী এবং সমস্ত দ্বিপাক্ষিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী। এর মধ্যেই ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে এক ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিবলে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে পাঁচটি S-400 Triumf Surface to Air Missile Defence System কেনার সিদ্ধান্ত নেয় যার মোট মূল্য ছিল ৫.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রাশিয়া বা অন্যান্য কয়েকটি দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৭ সালে যে CAATSA আইন (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) প্রণয়ন করেছিল ভারত তাকেও গুরুত্ব দেয়নি। ভারত-রাশিয়া S-400 চুক্তি করার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর আর্থিক নিষেধবিধি আরোপের হুমকি দিলেও ভারত তার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল। শুধু তাই নয়, দুটি দেশ ব্রাহ্মোস ক্রুজ মিসাইল, ভারতের হিন্দুস্তান এরোনটিকস্ কর্তৃক Sukhoi Su-30MKI যুদ্ধবিমান তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভারত একটি স্পষ্ট বার্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী দেশগুলিকে দিয়েছিল। সেটা হল ভারত তার বিদেশনীতি প্রণয়ন ও রূপায়ন করবে তার জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। ভারতের বিদেশনীতিতে বাস্তববাদী ভাবনার প্রতিফলনও স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। ভারতের যুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশও মেনে নিতে বাধ্য হয়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করার পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকট অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়াকে সরাসরি আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী দেশগুলি ইউক্রেনকে সামরিক এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করছে। আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিক নিষেধবিধি আরোপ করা হয়েছে। আমেরিকা এবং পশ্চিমের দেশগুলি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। একই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্য দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু ২০১৪ সালের মতোই ভারত এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে এমন অবস্থান গ্রহণ করেছে যা তার জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইউক্রেনের উপর রুশ হামলার বিষয়ে ভারত তার মনোভাব রাশিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে। তবে এই যুদ্ধে ভারত এক নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ এবং মানবাধিকার পরিষদে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা নিন্দা প্রস্তাবে ভারত ভোটদানে বিরত থেকেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু পশ্চিমী দেশের প্রস্তাব অনুযায়ী রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন করতে ভারত রাজি হয়নি। ভারতের তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়ার তৈলখনি থেকে উত্তোলিত তেল আমদানি করেছে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কয়েকটি পশ্চিমী দেশের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা না মেনে ভারত, রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে বিশেষত তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে ভারতের সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিফলিত। এ প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেছেন, 'সকলেই জানে ভারতকে তেল আমাদানি করতে হয়। আর এ কারণে ভারত সব সময় গ্লোবাল এনার্জি মার্কেটে নজর রাখে, কখন কোথা থেকে তেল কেনা যায় সেই সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে।' বিশ্বের অনেক দেশ বিশেষত ইউরোপ, রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমান জ্বালানি আমদানি করে থাকে; রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক বেশি জ্বালানি কেনে জার্মানি বা ইতালি। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞাকে এরাও গুরুত্ব দেয়নি। উপরন্তু এই নিষেধাজ্ঞা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আরোপ করেনি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আরোপ করলে তা হত বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা এবং ভারত অবশ্যই তা মেনে চলতো। কিন্তু কোনও একটি দেশ বা জোট যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সেটা মেনে চলার দায় ভারতের নেই। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা ও তার কয়েকটি সহযোগী দেশ। ভারত এই নিষেধাজ্ঞা মানতে বাধ্য নয়।

যুদ্ধ বা এই ধরনের কোনও আন্তর্জাতিক সংকটে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের আগে যে কোনও দেশকে তার ভূ-রাজনৈতিক এবং কৌশলগত অবস্থানের দিকে নজর দিতে হয়। ভারতের দুই প্রতিবেশী দেশ চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কৌশলগত বন্ধুত্ব আছে তা পুরোপুরি ভারতের বিরুদ্ধে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত যদি কট্টর রুশ বিরোধী অবস্থান নেয় তবে রাশিয়া-চীন-পাকিস্তানের মধ্যে জোট গড়ে উঠতে পারে যা ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকির সৃষ্টি করতে পারে। ভারত তার নিজের স্বার্থে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দিতে পারে না।

কিন্তু ভারত তার ঐতিহ্যগত যুদ্ধবিরোধী অবস্থান থেকে সরে আসেনি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উজবেকিস্তানের সমরখন্দে আয়োজিত Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-এর শীর্ষ সম্মেলনের বাইরে রুশ রাষ্ট্রপতি পুটিনের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মোদী মন্তব্য করেছেন 'Today's era is not an era of war'। এই উক্তি গোটা বিশ্বে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এর এক সপ্তাহ আগে বালিতে অনুষ্ঠিত G-20 শীর্ষ সম্মেলনে মোদী বলেন, 'ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি এবং কূটনীতির পথে ফিরে যাওয়ার রাস্তা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

ভারতের কৌশলগত স্বাতন্ত্র্যের এই নীতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধিকাংশ দেশই চাইছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে ভারত তার ভূমিকা পালন করুক। ভারত শান্তিপূর্ণ এবং কূটনৈতিক উপায়ে এই সংঘাত নিরসনে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে এবং এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে সামিল হয়েছে। গত ৫-৬ আগস্ট মোদী আরবের জেড্ডায় রুশ-ইউক্রেন সংঘাতের সমাধানের জন্য যে ৪০ দেশের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত তাতে অংশ নিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে ভারত নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। রুশ-ইউক্রেন সংকট সমাধানে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে German Council on Foreign Relations-এর সহকারী ফেলো জন যোসেফ উইলকিনস বলেছেন যে G-20-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ভারত যে নতুন দায়িত্ব পেয়েছে তাতে ভারত তার কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আরো নজর দেবে। তাঁর ভাষায়, 'বিভিন্ন বিশ্ব শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার ঐতিহ্য ভারতের আছে। কিন্তু এবছর ভারতের বিদেশ নীতি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি জোটনিরপেক্ষতার এক উন্নততর রূপকে গ্রহণ করেছে। এর ফলে নতুন দিল্লির আন্তর্জাতিক প্রভাব আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে।'

অনাস্থা প্রস্তাব
জনতার বিশ্বাস
২০২৪ সালে মোদীজীই ক্ষমতায় আসবে

তৃণমূলের তুমুল সন্ত্রাস সত্ত্বেও বিজেপির বৃদ্ধি ৭৬ শতাংশ

কৌশিক কর্মকার

এ যেন পিসি সরকারের পঞ্চায়েত নির্বাচন। যেখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং রাজনীতি শিকেয় তুলে গব্বের সঙ্গে 'এগিয়ে বাংলা'-র বোমশিল্প, বন্দুকশিল্প এবং সন্ত্রাস যাত্রার প্রদর্শন। পটলার পোষা গুন্ডাবাহিনী ছাড়াও ব্যাকস্টেজে ছিল রত্নগর্ভা 'বিডিও শ্রী' এবং বোবা বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু এত কিছুর পরও শেষরক্ষা হল না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির বৃদ্ধি ৭৬ শতাংশ, আদালতে ঝুলছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। পিঠ বাঁচাতে আবারও একমঞ্চে 'হাতে হাতে ধরি ধরি' বাম-তৃণমূল-কংগ্রেস। সব ম্যাজিক! বোম-বাম-বুম-বুম। এখন শুধু ফাটার অপেক্ষায়।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা পঞ্চায়েত নির্বাচন এখন আর স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ নয়; আক্ষরিক অর্থেই এখন তা একটি আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু। দেশীয় সংবাদমাধ্যমের পরিসীমা ছাড়িয়ে তা এখন বিদেশের সংবাদপত্রের আলোচ্য। পাকিস্তানের অন্যতম সংবাদপত্র দ্য ডন ৮ জুলাই ২০২৩ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটিতে পশ্চিমবঙ্গকে এক অনন্য অলংকারে ভূষিত করা হয়েছে: 'এ স্টেট নটোরিয়াস ফর পলিটিকাল ভায়োলেন্স'। আবার আরেক প্রতিবেশী দেশের বিদেশ মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটকে একটি মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কীসের মানদণ্ড? সহিংসতার মানদণ্ড। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত ২২ জুলাই ২০২৩ বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে মৃত্যু হলে বিশ্ব নীরব থাকে আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীরা কথা বলে মজা পান'। আলোচ্য ঘটনাক্রম থেকে যা অনুভব করা যায় তা হল অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হিংসাই সারা বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতি নির্মাণ করবে; বা বলা বাহুল্য সেই পরিচিতি হয়তো ইতোমধ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে।

একদা যে পশ্চিমবঙ্গ তার শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতিমনস্কতা তথা রুচিশীলতার কারণে সারা দেশে তথা বিদেশেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল আজ তার একমাত্র পরিচয় হিংসা, নির্বিচার হিংসা। ঠিক এই কারণেই যারা এখানে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করতেন তারা জনমানসে শ্রদ্ধেয় হিসেবে চিহ্নিত হতেন। কালক্রমে সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে তারা অভিহিত হলেন বিদ্বজ্জন বা বুদ্ধিজীবী অভিধায়। কিন্তু কালের পরিহাসে উক্ত শব্দদ্বয় কেবল যে তার

মর্যাদা হারিয়েছে তাই নয়, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ জনপরিসরে শব্দ দুটি প্রযুক্ত হচ্ছে অপশব্দ বা ইতর শব্দ হিসেবে। গ্রামীণ বাংলার আপামর স্বশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের কাছে এই শ্রেণি আজ চিহ্নিত হয়ে গেছে চূড়ান্ত সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, ভাতাসর্বস্ব একটি গোষ্ঠী হিসেবে। তাই এদেরই একটি উপদল যখন এই ব্যাপক হিংসার সপক্ষে দাঁড়িয়ে যান তখন আর কোন বিস্ময় বোধের উদ্রেক হয় না; তা পুরোপুরি স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ঘটনা হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার কাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে মৃত্যু মিছিল। ভোটগ্রহণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এক পক্ষ কালেরও বেশি সময় পূর্বে। কিন্তু এখনও এই অভিশপ্ত মিছিল শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ নজরে আসছে না। যদিও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ যে দৃষ্টান্ত রেখেছিল তা ছিল সততই অভূতপূর্ব। বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা বিশেষভাবে বিজেপি কর্মীরা তাঁদের প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। লাগাতার খুন ধর্ষণ লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ সমন্বিত যে ধ্বংসযজ্ঞ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল তাতে এরূপ একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে দলের সাধারণ কর্মীরা আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার সাহস অর্জন করতে পারবেন কিনা! কিন্তু কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ রাজ্যের সর্বত্র বিজেপি কর্মীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন ভয় দেখিয়ে তাদের দমন করা যাবে না। তাই এরূপ নারকীয় সহিংসতার শিকার হয়েও তাঁরা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং শাসক দল, পুলিশ ও প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, প্রতিরোধ করেছেন, যেখানে প্রকৃত নির্বাচন হয়েছে সেখানে জয়লাভ করেছেন। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় বর্তমান নির্বাচনে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই বিজেপির ফলাফল তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ। তৃণমূলের বেলাগাম সন্ত্রাস সত্ত্বেও ২০১৮ সালের তুলনায় পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে দ্বিগুণ আসনে জিতেছে বিজেপি। এবার জয় মিলেছে ১১ হাজার আসনে। ২০১৮তে যে সংখ্যা ছিল ৫,৬০০। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জয়ী আসন সংখ্যার নিরিখে পাঁচ বছরে বৃদ্ধি ৭৩ শতাংশ। ৫,৭৭৯ থেকে বেড়ে এবার জয় মিলেছে ১০,০০৪ আসনে। একইভাবে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৩২ শতাংশ। ৭৬৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ১,০১৮টি আসন। এবং জেলা পরিষদ স্তরে বৃদ্ধি ৪০ শতাংশ। জয়ী আসন সংখ্যা ২২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩১টি আসন। গত পাঁচ বছরে মোট প্রাপ্য ভোটের হার ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩ শতাংশ। জেলায় জেলায় তৃণমূলের লাগামছাড়া সন্ত্রাস সত্ত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬ শতাংশ।

মিশন ও জেলা স্তরের সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত 'মমতাময়ী' ইকোসিস্টেম যে যেকোন প্রকারে বিরোধী দলগুলিকে ভোটের ময়দান থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, তার সাম্প্রতিকতম প্রমাণ ২৭ জুলাই ২০২৩ কলকাতা হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক ও উলুবেড়িয়া এক নম্বর ব্লকের বিডিওকে মহামান্য আদালত সাসপেন্ডের সুপারিশ করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এমন 'বিডিওশ্রী'-র উদাহরণ ভুরিভুরি এবং তাঁদের অনেকেরই জারিজুরি ফাঁস হয়ে যেতে পারে আদালতে। নির্বাচনের গণনার অব্যবহিত পরেই উচ্চ আদালত ঘোষণা করেছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোন জয়ই চূড়ান্ত নয়; কোন প্রার্থীকেই জয়ী ঘোষণা করা যাবে না। আসলে এই পঞ্চায়েত ভোট সারা বিশ্বের সামনে গণতন্ত্রের উলঙ্গ রূপকে আকাঁড়াভাবে পরিস্ফুট করেছে। বস্তুত কী ঘটেনি এই নির্বাচন পর্বে? শাসকদলের প্রার্থীর ব্যালট পেপার গলাধঃকরণ করা থেকে শুরু করে ক্যামেরার সামনে ভয়ার্ত পুলিশ কর্মীর নিরাপত্তাহীনতার অসহায় মুখ সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই একটি বৃহৎ প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে

উপস্থাপিত করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে গণনা পর্ব চলছে; একজন গণনা কর্মী কী উপায়ে টানা চব্বিশ ঘণ্টা ভোট গণনা করতে পারেন? এর অনিবার্য ফলাফল হিসেবে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরের গণনায় লক্ষ করা গেছে ব্যাপক অনিয়ম ও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। গণনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই শাসক দলের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে; বিরোধী দলগুলির জয়ী প্রার্থীদের জয়ের সার্টিফিকেট না দেওয়া থেকে শুরু করে এই পর্বের একেবারে সাম্প্রতিক সংযোজন বিজয়ী প্রার্থীর অপহরণ কাণ্ড! পশ্চিমবঙ্গ নামক রঙ্গমঞ্চে এহেন সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি প্রহসন অনুষ্ঠিত করার যাবতীয় কৃতিত্ব আবশ্যিকভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্য। যে অভূতপূর্ব দৃশ্যপট তাঁরা রাজ্যবাসীকে উপহার দিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন।

আর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অপার হিংসা। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল এই নৃশংস হিংসার পটভূমিতেই গত

বাকি অংশ ৩২ পাতায়

ছবিতে খবর

বীরভূম জেলার রামপুহাট বিধানসভার কাষ্ঠগড়া অঞ্চলে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করার পর বিজেপি কর্মীদের জয়ের উল্লাস।

বীরভুম জেলার কড়িধ্যার গ্রামসভায় নিরঙ্কুশভাবে জিতেছে বিজেপি। বিজয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার কালীগঞ্জ বিধানসভার ফরিদপুর অঞ্চল দখল নিলো ভারতীয় জনতা পার্টি।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বাগদা বিধানসভার কোনিয়ারা ১নং এবং ২নং পঞ্চায়েতে ভারতীয় জনতা পার্টির বোর্ড গঠন সম্পূর্ণ হল

রানিবাঁধ বিধানসভা কেন্দ্রের গোড়াবাড়ি অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত করলো বিজেপি

রায়গঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করলো ভারতীয় জনতা পার্টি।

রেজিনগর বিধানসভার কামনগর পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে এলো, প্রধান হলেন বিজেপির বাপন ঘোষ এবং উপপ্রধান হলো বিজেপির মৌমিতা মন্ডল।

বহরমপুর বিধানসভার রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন বিজেপির সুমিত্রা ঘোষ এবং উপপ্রধান হলেন বিজেপির সাহেব সরকার।

ইটাহার বিধানসভার অন্তর্গত পতিরাজ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করলো ভারতীয় জনতা পার্টি।

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্দরানফুলবাড়ী-১ অঞ্চলের পঞ্চায়েত গঠন করল বিজেপি।

বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া বিধানসভার অঙারগড়িয়া অঞ্চলে পঞ্চায়েত গঠন করলো বিজেপি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া অঞ্চলে পঞ্চায়েত গঠন করলো বিজেপি।

ছবিতে খবর

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচনে দেবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি।

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলবাড়ি অঞ্চলে পঞ্চায়েত গঠন করলো বিজেপি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুশমন্ডি ব্লকের ৫ নং দেউল অঞ্চলে বিজেপি পঞ্চায়েত গঠন করল।

নবদ্বীপ বিধানসভার জোয়ানিয়া পঞ্চায়েত বিজেপি গঠন করলো।

রামনগর দুই নম্বর ব্লকের সটিলাপুর পঞ্চায়েত, পুড়শুড়া-২ পঞ্চায়েত, খেজুরি ১ নম্বর ব্লকের বীরবন্দর পঞ্চায়েত এবং ময়ূরহাট ১ নং অঞ্চলের বোর্ড গঠন করলো বিজেপি।

দাসপুর -২ ব্লকের ৩নং রানীচক গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল ভারতীয় জনতা পার্টি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে, সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি শ্রী জে পি নাড্ডাজী কোলাঘাটে পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়েতিরাজ পরিষদ কর্মশালার শুভারম্ভ করলেন

কলকাতা বিমানবন্দরে সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা জীকে স্বাগত জানালেন রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রদ্ধেয় বি.এল. সন্তোষ জীকে কোলকাতা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন শ্রী মঙ্গল পাণ্ডে, শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে কাঁথিতে ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

লোকসভার প্রবাস যোজনার অন্তর্গত বিস্তারকদের বিশেষ বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের অবহেলার প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ।

মাদক মাফিয়া মণিপুর

রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী

বেআইনি মাদক ও আফিম চাষই কি মণিপুর হিংসার উৎসস্থল? চিন, মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং নেপালের মাদক-মাফিয়াদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কই কি হিংসার আগুন ছড়াচ্ছে মণিপুরে? কিন্তু কেন? দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মাদক-মাফিয়াদের একটা 'সিস্টেম'-কে কড়া হাতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং গুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। স্বার্থে ঘা পড়তেই কি মণিপুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি বেছে নিয়েছে হিংসার চিত্রনাট্য?

মণিপুরে প্রগতি, উন্নয়ন ঘটছে ধীরে ধীরে। মানুষ পেতে শুরু করেছে নিরাপদ জীবন আর সমৃদ্ধ অর্থনীতির সুবিধা। নতুন অবকাঠামো প্রকল্প, পর্যটন ব্যবসার প্রসার, সেই সঙ্গে গড়ে ওঠা উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাল্টে দিচ্ছে মণিপুর অর্থনীতির কাঠামো। বর্তমান বাজার মূল্যে ২০২২-২৩ সালে মণিপুরের জিএসডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ রাজ্য আয়) ছিল ৪২৩,০০ কোটি টাকা যা মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় ৫.৫২ বিলিয়ন। ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত রাজ্যের জিএসডিপি অগ্রগতির হার ১১.৬৭% যা ভারতের অনেক রাজ্যের থেকে বেশি। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির সুত্র ধরে মণিপুর যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্যের বিকল্প প্রবেশপথ হতে চলেছে, তখন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত পুষ্ট মাদক ব্যবসা মণিপুরের এগিয়ে যাবার স্বপ্নকে আটকে দিতে বধ্য পরিকর।

মাদক মাফিয়ারা দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরকে মাদক ব্যবসার স্বর্ণালি ত্রিভুজ বা গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের অঞ্চলগুলির সাথে যুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে তুলেছে এক মারাত্মক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। মণিপুর রাজ্যের মাদকবিরোধী বিশেষ ইউনিট নারকোটিক্স অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স অফ বর্ডার (এনএবি)-এর তথ্য অনুসারে, মণিপুরের পাহাড়ে ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫,৪৯৭ একর জমি জুড়ে আফিম চাষ হয়েছে। তার মধ্যে ১৩,১২২ একর কুকি-চিন-অধ্যুষিত এলাকায়, ২,৩৪০ একর নাগা-অধ্যুষিত এলাকায় এবং ৩৫ একর অন্যদের অধীনে ছিল। এনএবি তথ্য দেখায় যে কুকি-চিন-অধ্যুষিত এলাকায় আফিম চাষের এলাকা ২০১৭-১৮ সালে ২০০১ একর থেকে ২০২১-২২ সালে ২৬০০ একর থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

তামাকজাত দ্রব্য, গাঁজা, আফিম, স্প্যাসমো প্রক্সিভন (এসপি), মেথামফেটামিন (ডব্লিউওয়াই), কোডাইন কাশির সিরাপ, সিউডো-ইফেরিন ইত্যাদি আজ মণিপুর রাজ্যে সহজলভ্য। মায়ানমার থেকে মান্দালে এবং ভামো

হয়ে আফিম, মেথামফেটামিন এবং হেরোইন লাশিও আসে মণিপুরে। আবার মোরে এবং চাম্পাই হয়ে ওই একই মাদক অবৈধভাবে আসে মিজোরামে। মাদক পাচার এখন আর মণিপুরের স্থানীয় ব্যবসা নয়; এটি এখন চিন, মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং নেপালের মাদক-মাফিয়াদের একটি বহু-জাতীয় ব্যবসার নেটওয়ার্ক। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতেও এই অবৈধ এবং কুখ্যাত ব্যবসা চলছে গোপন নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে। আর চোরাচালান হয়ে আসা এই মাদক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সর্বত্র।

মূলধারার কৃষির তুলনায় আফিম চাষ তুলনামূলকভাবে সহজ। বছরে দুবার ফসল বপন করা হয় এবং বসন্ত ও শীতের প্রথম দিকে কাটা হয়। ঝুম কৃষকেরা অন্য কৃষিদ্রব্য চাষের মধ্যেই আফিম চাষ করতে পারে। আফিম থেকে হেরোইন রূপান্তরের বিচারে মণিপুরের আফিমের আন্তর্জাতিক মূল্য খুবই লাভজনক। প্রাথমিকভাবে পশ্চিম মায়ানমারের ড্রাগস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ করে মণিপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়ী গ্রামগুলি। অত্যন্ত দরিদ্র উপজাতীয় কৃষক বিকল্প রুজির অভাবে এই চাষ করে। দেশ বিদেশের মুনাফাখোর অসাধু ব্যবসায়ী এই মাদক ব্যবসার মূল কান্ডারী। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের সঙ্গে মণিপুরের নৈকট্য সমগ্র পাহাড় ঘেরা মণিপুর-মায়ানমার সীমান্তকে এক ড্রাগ করিডোরে পরিণত করেছে। সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী দল মাদক ব্যবসায় জড়িত। এই মাদক চোরাচালান মণিপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাঁধন ভেঙে চুরমার করেছে।

মাদকের অপব্যবহার যুবক এবং শিশু সহ সমাজের প্রতিটি অংশকে গ্রাস করেছে। কখনও কখনও বেআইনি টাকার প্রলোভনে এই মাদক ব্যবসায় আশ্রয়দাতা হয়ে উঠছে শীর্ষস্থানীয় আমলা এবং রাজনীতিবিদরাও। মণিপুরে মাদকের ব্যবহার এবং এইচআইভি/এইডসের মধ্যে একটা বড়ো সংযোগ রয়েছে। মণিপুর স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির রিপোর্ট অনুসারে ভারতের মোট এইচআইভি পজিটিভ কেসের প্রায় ৮ শতাংশ মণিপুরের, অথচ ভারতের জনসংখ্যার ০.২ শতাংশ মানুষ মণিপুরে বাস করে।

মণিপুরের মত আফগানিস্তানেও দেখা গেছে এই একই ঘটনা। আফিম চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সেখানেও সাধারণের মধ্যে মাদকাসক্তি বেড়েছে, ধ্বংস হয়েছে আদিবাসীদের পরম পবিত্র পাহাড়, বন-বনানী আর প্রাকৃতিক পরিবেশ। ধানের জমিও সেখানে আফিম চাষে লেগেছে, ফলে ধান উৎপাদন কমেছে ব্যাপক হারে। ফলন বাড়াতে ব্যবহার করা হয়েছে রাসায়নিক সার, দূষিত হয়েছে পরিবেশ। সুতরাং এখনই কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ না করলে মণিপুর একদিন আফগানিস্থানকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে মণিপুরে রাজ্য সরকার মাদকের প্রচলন এবং আফিম চাষের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রোধ করতে হস্তক্ষেপ করেছে।

এই ধরনের ক্ষতিকারক ব্যবসা এবং ভোগ ভাবনা উপড়ে ফেলতে রাজ্য সরকার মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নংথোম্বাম বীরেন সিং-এর নেতৃত্বে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাচ্ছে। ২০১৮ সালে শুরু হয় 'নিশা থাদোক্লসি' এবং 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর মতো প্রচারাভিযান। এই প্রকল্পে প্রতি জেলায় ১০০ জনের এক বিশেষ পুলিশ টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মূল লক্ষ্য মাদক উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থাকে প্রতিদিন ব্যতিব্যস্ত করা। গত কয়েক বছরে ২০০০ কোটির বেশি টাকার হেরোইন, ব্রাউন সুগার ও অন্যান্য মাদক ওষুধ জব্দ করা হয়েছে এবং পাঁচটি ওষুধ তৈরির অস্থায়ী কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বে নিষিদ্ধ মাদকের সবচেয়ে বড় সংগ্রহ হিসাবে পরিচিত থাউবাল জেলায় ২০১৯ সালে পুলিশ একটি অবৈধ ওষুধ তৈরির কারখানা থেকে ১৬৬ কোটি টাকা মূল্যের ১৮৪.৬৫ কিলোগ্রাম (কেজি) ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে। চুরাচাঁদপুর জেলা পুলিশ ব্রাউন সুগার তৈরির জন্য ব্যবহৃত একটি কারখানার হদিস পেয়ে তা গুঁড়িয়ে দেয়। ২০২২ সালে মায়ানমার সীমান্তবর্তী মণিপুরের টেংনুপাল জেলায় পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে ৪৪.৫ কেজি 'ওয়ার্ল্ড ইজ ইওরস' (ডব্লিউওয়াই) ট্যাবলেট, পরিচিত নাম 'পার্টি ড্রাগস' যার বাজার মূল্য ৯ কোটি টাকা এবং আরও কয়েক কেজি ডব্লিউওয়াই ট্যাবলেট যার বাজার মূল্য ৫ কোটি টাকা। দৃষ্টান্তগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় মণিপুর রাজ্যে ব্রাউন সুগার এবং হেরোইনের মতো আফিম-সৃষ্ট ব্যবসার রমরমা অবস্থা।

মণিপুরের উখরুল, সেনাপতি, কাংপোকপি, কামজং, চুরাচাঁদপুর এবং টেংনোপাল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অবৈধ আফিম চাষ আর তাতে ড্রাগ মাফিয়াদের ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে রাজ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ইউরিয়ার যা সঙ্কট তৈরি করেছে অন্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইন ১৯৮৫, মণিপুর নারকোটিক্স অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স অফ বর্ডার (এনএবি) বিভাগ গত পাঁচ বছরে, জানুয়ারি ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত বন থেকে বেআইনি দখলদার বলে চিহ্নিত ২৫১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে ৩৮১ জন মেইতেই, ১০৮৩ জন মুসলিম, ৮৭৩ কুকি-চিন এবং ১৮১ জন অন্যান্য। এনএবি তথ্য অনুযায়ী সরকার ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৮,৬৬৪ একর আফিম বাগান ধ্বংস করেছে। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং উখরুল জেলার একটি গ্রামকে স্বেচ্ছায় পপির গাছ ধ্বংস করার জন্য মোট নগদ ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কৃতও করেছিলেন।

পপি চাষীদের মধ্যে বিকল্প জীবিকা প্রদান, মাদক আটকে উৎসাহ প্রদান এবং মাদক নির্মূল অভিযান চালানো হয়েছে রাজ্যের সর্বত্র। এছাড়াও নাগরিক সংস্থাগুলিকে দিয়ে আফিম চাষ থেকে মানুষকে বিরত রাখার সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বানকে সমর্থন করতে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ মণিপুরের ৩৩টি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা 'অবৈধ আফিম চাষের বিরুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের অঙ্গীকার সম্মেলন' করে। প্রায় সব জেলার কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় আফিমের বিকল্প ফসল হিসাবে এলাচ এবং লেমনগ্রাস চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আফিম চাষের সম্প্রসারণকে মোকাবিলা করতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে বিকল্প জীবিকায় নিযুক্তির পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায় সরকার যথেষ্ট মানবিক।

তবে আফিম থেকে যা মুনাফা আসে তা সহজে অন্য চাষে আসবে না। সহজ অর্থ এবং লোভ থেকে সরে এসে অভ্যাস বদলাতে সময় লাগবে। ম্যাজিকের মত একরাতে বদলে যাবে না, বহুদিন ধরে চলে আসা একটা সিস্টেম এবং মাদক কারবারীদের সঙ্গে যুক্ত থেকে সহজ অর্থ উপার্জনের লোভ। মাদকজাত দ্রব্যের চাষ, বন্টন ও ব্যবহার রুখতে যে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নংথোম্বাম বীরেন সিং। আর সেই সিদ্ধান্তকে বানচাল করতেই নানান প্রচেষ্টা আর তার থেকেই ভয়াবহ দাঙ্গা।

বৈষ্ণব মণিপুরে বহিরাগত সন্ত্রাস

সৌভিক দত্ত

কুকিদের ব্যবহার করে মিশনারিরা কি মণিপুরকে তাঁদের উপনিবেশ বানাতে চায়? কংগ্রেস আমলের আইনকে ব্যবহার করে মণিপুরের ৯০ শতাংশ পাহাড়ি জমি কুকিদের দখলে। যে জমিতে এতদিন রমরম করে চলছিল আন্তর্জাতিক মাফিয়া নেটওয়ার্কের মাদক ব্যবসা ও আফিম চাষ। মণিপুর হাইকোর্টে মেইতিদের তপশিলি জনজাতির তকমা ফিরিয়ে দেওয়ার রায় কি স্বার্থে ঘা দিয়েছে বহিরাগত কুকি-মিশনারি মিশন এবং আন্তর্জাতিক মাফিয়া নেটওয়ার্কের?

ভারতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত নতুন কিছু নয়। ভারতের মাটিতে এক উপাস্যপন্থী সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি আমদানী করার দিন থেকেই বহুত্ববাদের এই শেষ ঘাঁটিটিকে দখলে আনার চেষ্টা চলেছে বহু বছর ধরে। কারণ হিন্দু সংস্কৃতিই একমাত্র সংস্কৃতি যে ওই সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে চোখ রেখে লড়ে গিয়েছে নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য। বাকিরা হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর নয়তো সমঝোতা করে নিয়েছে। প্রতিরোধ একমাত্র টিকিয়ে রেখেছে ভারতবর্ষ! আর সেইজন্যই কাশ্মীর থেকে সিংহল আর গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এই যে বিস্তৃত বহুত্ববাদের লীলাভূমি আছে, তার উপর আক্রমণ এসেছে অবিরত। গান্ধার (আফগানিস্তান) থেকে শুরু করে পাকিস্তান-বাংলাদেশ-শ্রীলংকা-নেপাল-ভূটান হয়ে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) পর্যন্ত একের পর এক ভূখণ্ড হয়েছে বিচ্ছিন্ন। কাশ্মীরকে করা হয়েছে টালমাটাল! পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মিনি পাকিস্তান! আর এবার তাঁদের থাবা পড়েছে মণিপুরে!

তবে হ্যাঁ এবার তাঁদের থাবা পড়েছে— কথাটা ইতিহাসগতভাবে ভুল। থাবা এখন পড়েনি। পড়েছিল বহু আগেই। বিষয়টা বুঝতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে ১৯২৭ সালের দিকে। সেই বছর ভেরিয়ার এলউইন (Verrier Elwin) খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারী হিসেবে ভারতে আসে। ইংরেজি সাহিত্যে এবং ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করা এই মিশনারি ভারতে এসে ভারতের উপজাতিদের মধ্যে কাজ শুরু করে। শুরু করে তাঁদের ধর্মান্তকরণ! গান্ধী-নেহেরু গোষ্ঠীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই এলউইন। তাঁদের সখ্যতা এতদূর যায় যে নেহেরু ১৯৫৪ সালে এলউইন কে উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির উপদেষ্টা নিয়োগ করে দেয়। ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের পলিসিগত সব সিদ্ধান্তই বকলমে এলউইনেরই নেওয়া।

সেই শুরু! আজ সেই মিশনারিরাই বলতে গেলে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। আজ ভারতের উত্তর-পূর্বে প্রায় তিনটি রাজ্য খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর দখলে। সেখানে আইনের শাসন চলে না। চলে মিশনারি শাসন। আর তাঁদের সবথেকে বড় অস্ত্র হল কুকি উপজাতিরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের এক জলজ্যান্ত সমস্যা হল এই ধর্মান্তরিত কুকি উপজাতিরা। প্রধানত মায়ানমার থেকে আসা এই উপজাতিরা প্রায় সবাইই ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। জনসংখ্যার ২৮% এই কুকি উপজাতির বাস। অথচ জমির

সিংহভাগ তাঁদের দখলে। অন্যদিকে মেইতি উপজাতি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ তাঁদের হাতে জমির পরিমাণ সামান্য। মণিপুরের মাত্র ১০ শতাংশ সমতল ভূমিতে মেইতিদের বসবাস। বাকি ৯০ শতাংশ পাহাড়ি এলাকায় জনজাতি কুকিদের বাস। কুকিরা তপশিলি জনজাতিভুক্ত হওয়াতে সংরক্ষণ সহ অন্যান্য সুবিধাও পায়। আমলাতন্ত্রও সেই কারণে বহুলাংশে তাঁদের দখলে। সংখ্যায় বেশী হয়েও ভূমিপুত্র মেইতিরা বহিরাগত কুকিদের সামনে নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

একে মেইতিদের হাতে সামান্য জমি। কিন্তু কংগ্রেসি আমলে হওয়া আইনের কারণে পাহাড়ি এলাকায় জমি কিনতে পারে না মেইতিরা। অথচ কুকিদের বেলায় তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তার উপরে তাঁরা এখন আর তাঁদের জনসংখ্যার হার ধরে রাখতে পারছে না। এখন তাঁদের জনসংখ্যা প্রায় ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে। তার কারণ মায়ানমার এবং বাংলাদেশ থেকে অনর্গল অবৈধ অনুপ্রবেশ। জনসংখ্যাতেও পিছিয়ে পড়ার উপক্রম হওয়ায় তাঁরা অস্তিত্ব সংকটের ভয় পেয়েছিল। ফলে মেইতিরা বাধ্য হয়ে ইনার পারমিট সিস্টেম চালু করার দাবি তুলেছিল। এই সিস্টেম ইতিমধ্যেই অরুনাচল, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে চালু রয়েছে। কিন্তু কুকিদের বাধার মুখে এই সিস্টেম চালু করা যায়নি।

তখন বাধ্য হয়েই মেইতিরা অস্তিত্বরক্ষার জন্যে নিজেদের তপশিলি জনজাতিভুক্ত করার দাবি তোলে যাতে সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধাগুলো তাঁরা অন্ততপক্ষে পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁদের এই অধিকার নতুন কিছু না। আগেও তাঁরা তাই ছিল। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তাঁরা তপশিলি উপজাতির মর্যাদা ভোগ করে আসছিল। কিন্তু তারপর তাঁদের থেকে সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই নিয়ে মেইতিরা মণিপুর হাইকোর্টে রিট করলে হাইকোর্ট মেইতি জনগোষ্ঠীকে তপশিলি জনজাতির তকমা দেওয়ার পক্ষে রায় ঘোষণা করে। আর তারপর থেকেই যাবতীয় সমস্যার শুরু হয়। হয়তো কোর্ট এত তাড়াহুড়ো না করলে সমস্যা এতদূর গড়াত না।

আসলে শিক্ষা সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের দিক থেকে মেইতিরা অনেক উন্নত। মূলত তাঁদের হাত ধরেই মণিপুরের মূল সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। মনিপুরি শাস্ত্রীয় নৃত্য তো পৃথিবী বিখ্যাত। তাঁদের ভাষা মৈথিলান ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে। মণিপুরে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্কুলে এই ভাষা পড়ানো হয়। প্রায় প্রতিটি মেইতিই ধর্মপ্রাণ হিন্দু (বৈষ্ণব)!

অন্যদিকে বহিরাগত কুকিরা এখনও আধা বর্বর পর্যায়েই আছে। তাঁদের না আছে নিজেদের সংস্কৃতি না আছে ঐতিহ্য! মোঙ্গল অরিজিনের এই উপজাতি বর্তমানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। মূলত ভোটব্যাংক আর বিদেশী সাহায্যের উপরেই মণিপুরে ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাঁরা। তাই তাঁদের ধারণা, যদি মেইতিরা তপশিলি জনজাতির অধিকার ফিরে পায় তাহলে কুকিদের ক্ষমতা কমে যাবে। সেইজন্যই কোর্টের রায় ঘোষণার পর থেকেই মণিপুর জুড়ে এত দাঙ্গা শুরু করেছে ওরা।

এই কুকিদের তৈরী করা আরেকটি বড় সমস্যা হল মাদক ব্যবসা। কংগ্রেসি আমলে নেওয়া কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মণিপুর গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের অংশ হয়ে গিয়েছিল। এই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল হল এশিয়ার অবৈধ আফিম উৎপাদনের দুটি প্রধান ক্ষেত্রের (অন্যটি গোল্ডেন ক্রিসেন্ট) একটি। চিন, থাইল্যান্ড, লাওস এবং মায়ানমারের প্রায় ৯৫০০০০ বর্গকিলোমিটার স্থান নিয়ে এই মাদক ব্যবসার ক্ষেত্র বিস্তৃত। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে ভারতের কিছু অংশও এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। আর মোঙ্গল অরিজিনের এই কুকিরাই ছিল মাদক ব্যবসার মূল কান্ডারি। মাদক ব্যবসা থেকে আগত টাকা সেই স্থানের ভারতবিরোধী ও হিন্দু বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হত। মাদক ব্যবসার টাকায় ও বিদেশ থেকে আসা অস্ত্রের টাকায় শক্তিশালী কুকিরা স্থানীয় উপজাতিদের সাথে দাঙ্গা করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল। ১৯৯২-৯৩ সালে নাগাদের সাথে, ১৯৯৭-৯৮ এ পেইতিদের সাথে, ২০০৯-১০ সালে কারবিদের সাথে, ২০১১ সালে ডিমাসাদের সাথে দাঙ্গা করেছে ওরা। আর এখন করছে মেইতিদের সাথে। ওদের মূল উদ্দেশ্য এটাই স্থানীয় সব উপজাতিদের হঠিয়ে দিয়ে পুরো এলাকা মাদক ব্যবসা তথা মিশনারিদের নিয়ন্ত্রণে আনা। পুরো পাহাড়কে মাদক আর অস্ত্রের ঘাঁটি বানিয়ে দিয়েছিল ওরা। চীনা অত্যাধুনিক AK-৫৬ অ্যাসল্ট রাইফেল ছিল ওখানে অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। মদত দিয়েছিল মিশনারিরা আর চীন। উদ্দেশ্য ছিল ওই এলাকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। আর বর্তমানের জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনী দিয়ে ওদের মাদক ব্যবসা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বলেই ওরা এমন মরণকামড় দিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে।

মিশনারিদের নিয়ন্ত্রণে কুকিরা কতটা হিন্দু বিরোধী হয়ে উঠেছে তার নমুনা পাওয়া যায় একটা ছোট্ট তথ্যে। মণিপুরে অসংখ্য হিন্দু মন্দির ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। যার মধ্যে ১১টা বড় ও বিখ্যাত মন্দিরও আছে। সেগুলো হল

৪টি তেঙ্গুপাল এবং মোরেচ-এর মন্দির, ৩টি টিপাইমুখ চুরচানপুর এবং ৪টি চিঙ্গোই চিং ইম্ফল পূর্বের মন্দির। এগুলি ছাড়াও বহু মন্দির ধ্বংসের শিকার হয়েছে। যদি এটা কমিউনিস্টদের বর্ণিত কোনো গণ আন্দোলন হত তাহলে নিশ্চয়ই শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব মেইতিদের মন্দির ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়ত না। মন্দির ধ্বংসই কুকিদের আসল উদ্দেশ্য আমাদের সামনে নিয়ে আসে।

মণিপুরে যা হচ্ছে তা মূলত ভারতকে খন্ডবিখন্ড করে দেওয়ার মিশন। বিদেশী শক্তি বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছে ভারতের অধিবাসীদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়িয়ে দেওয়ার। রাষ্ট্রশক্তির হিন্দু বনাম নিপীড়িত মুসলিম ন্যারেটিভ দিয়ে যখন ভারত ভাঙা গেলো না তখনই আসতে লাগল নতুন নতুন লড়াইয়ের গল্প। হিন্দু বনাম শিখ, ট্রাইবাল বনাম নন-ট্রাইবাল, ব্রাহ্মণ-দলিত বা রাজপুত-দলিত কিংবা পশ্চিমবঙ্গে মাঝেমধ্যেই উত্তরবঙ্গ বনাম দক্ষিণবঙ্গ, বাঙাল বনাম ঘটি, ফরোয়ার্ড কাস্ট বনাম লোয়ার কাস্ট ঝামেলা লাগিয়ে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য একই। ভারতবাসীর ঐক্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ভারতকে খন্ডবিখন্ড করে ফেলা আর তারপর কমিউনের উপযুক্ত করে নেওয়া। সেই গঙ্গাধর অধিকারী থিসিসের আমল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির ভারত ভাঙ্গার চক্রান্ত শুরু। '৪৭ এ দেশভাগের সময়ও মুসলিম লীগের বড় সাহায্যকারী ছিল তাঁরা। আর এখনও কাশ্মীরে জেহাদী হোক বা নর্থ ইস্টে মিশনারি হোক— যেখানেই ভারত ভাঙ্গার চেষ্টা হয় সেখানেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাঁরা।

সমস্ত দেশবিরোধী শক্তিদের এই একত্রিত প্রচেষ্টা যে মণিপুরে তৈরী হয়েছে তাকে পরাজিত করাই হোক আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

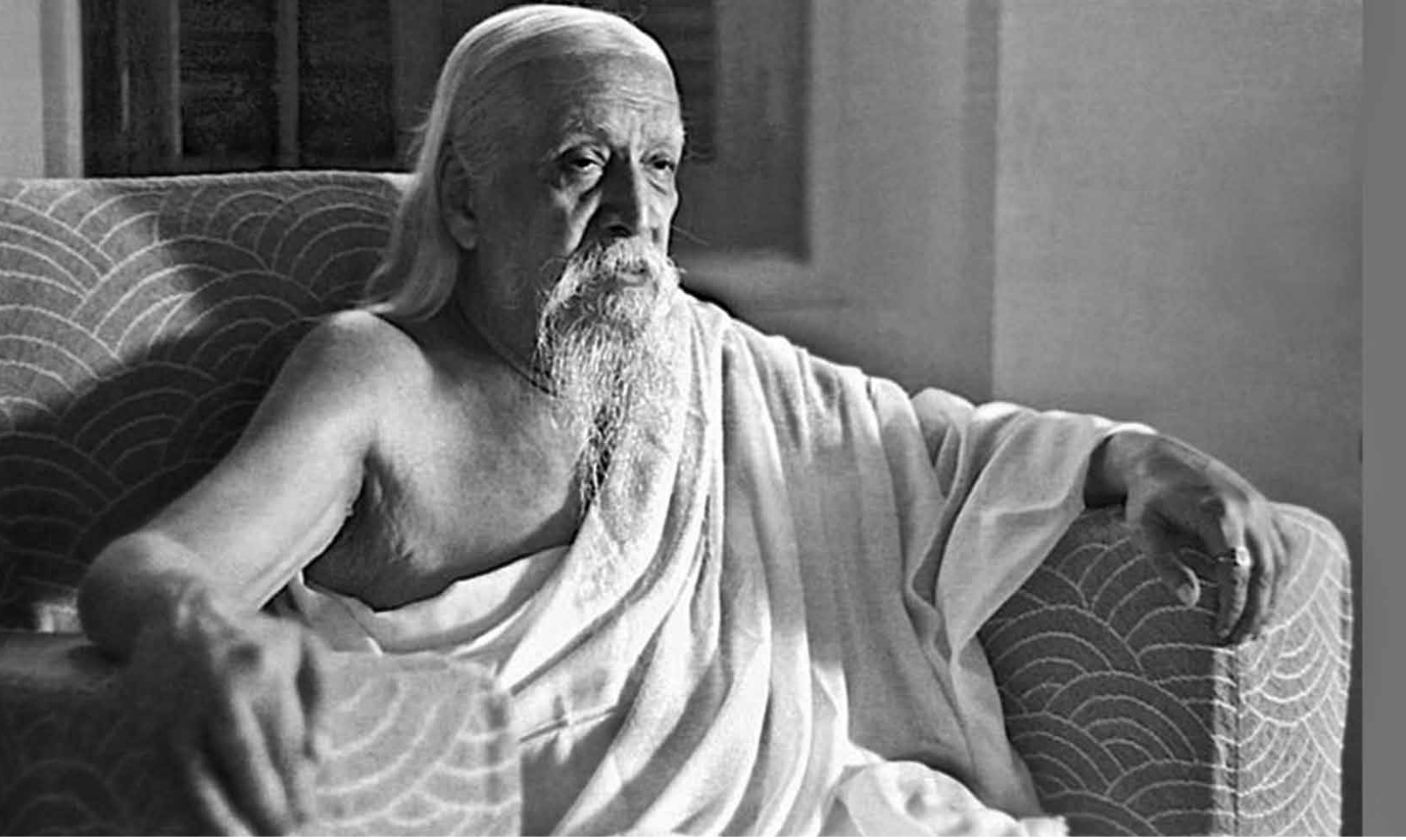

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক

পুলকনারায়ণ ধর

সশস্ত্র পন্থা শ্রীঅরবিন্দের কাছে একটি 'পন্থা' হলেও তাঁর চিন্তার মৌলিক ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ তথা অধ্যাত্মিক দর্শন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের মূল কথা 'ধর্ম'। ভারতকে উদ্ধার করবার প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে 'ধর্মে'। জ্ঞানের বলই প্রকৃত বল। এই ধর্ম ও জ্ঞান বলে তিনি ভারতের ঐক্য ও মুক্তি সাধনার পথ দেখিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: জন্ম ১৮৭২ - মৃত্যু ১৯৫০

ভারতীয় চিন্তা ও মননের জগতে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এক অগ্রগণ্য পুরুষ যিনি প্রকৃত অর্থে আধুনিক রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির প্রেক্ষিতে সনাতন ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের রাজনৈতিক বৈদান্তিক ভাবনার পতাকার নীচে ভারতবাসীকে জড়ো হবার ডাক দিয়েছিলেন। সে যুগের 'নরমপন্থী'-দের বাধা ভেঙে যে 'চরমপন্থী' রাজনীতি প্রবাহ স্বদেশী ভাবনার জন্ম দিয়েছিল তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)। এই প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যেও। তাঁর 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রচ্ছদে জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি মুদ্রিত হত। 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত খড়্গসহ মা-কালীর ছবি। এই আবহেই শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় 'বগলা' মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন (১৯০৩)। বিপ্লবী কর্মীদের গীতা ও তরবারি স্পর্শ করিয়ে বিপ্লবের শপথ করাতেন। চরমপন্থীরা সশস্ত্র পদ্ধতির কথা বলতেন। শ্রীঅরবিন্দ চরমপন্থীদের মুখ্যনেতা ছিলেন। কিন্তু অরবিন্দের কাছে সশস্ত্র পন্থা ছিল একটি 'পন্থা' মাত্র। তাঁর চিন্তার মৌলিক ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ তথা অধ্যাত্মিক দর্শন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির পরম্পরা স্থাপনই ছিল তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য। সেটাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ভূমি।

শ্রীঅরবিন্দ যে রাজনৈতিক দর্শনকে 'বেদান্ত'-এর সঙ্গে মিলিয়ে ছিলেন তা ছিল অত্যন্ত উচ্চমার্গের। সে বিষয়ে শুধু এইটুকু বলা যায় যে তা পরাধীন ভারতের সমগ্র জাতির আত্মিক অভ্যুদয়েরই পথ। আত্মিক অভ্যুদয় না ঘটলে স্বাধীনতা প্রাপ্তিও অর্থহীন বা শূন্যই থাকবে। একটা জাতির জীবন দর্শনই তার মুক্তির পথ। স্বামী বিবেকানন্দও একথা বলেছেন যে 'ধর্মই ভারতের

মূল প্রাণ। ধর্ম না থাকলে ভারত থাকবে না।' শ্রীঅরবিন্দের দর্শনেরও মূল কথা 'ধর্ম'। ভারতকে উদ্ধার করবার প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে 'ধর্মে'। জ্ঞানের বলই প্রকৃত বল। এই ধর্ম ও জ্ঞান বলে তিনি ভারতের ঐক্য ও মুক্তি সাধনার পথ দেখিয়েছেন। 'ধর্ম' অর্থে তিনি তিলক কেটে মন্দিরে ঘণ্টা বাজান বোঝান নি। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তাই বহু শতাব্দীর হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মৌলিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন জাতীয় সংহতির বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে। তাঁর বিচারে 'জাতীয়তাবাদ শুধু রাজনীতি নয়, এটা হচ্ছে ধর্ম' (a creed, a faith)। তিনি পরিষ্কার বলছেন 'I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism.' (Karmayogi in Early Political writings 2/page 10).

ভারতীয় ভাবনা ও জীবনবোধকে বিজাতীয় শাসকরা অর্থাৎ মুসলমান ও ইংরেজরা প্রায় এক হাজার বছর ধরে আঘাত করেছে। ভারতীয়ত্বকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। এর বিরুদ্ধেই ছিল অরবিন্দ তথা বিপ্লবীদের প্রকৃত সংগ্রাম। তাই ইংরেজের অপসারণ ছিল রাজনৈতিক প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের উৎস কোথায়? কে তাঁর অনুপ্রেরণা? তিনি কি রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? না। কয়েক পুরুষ 'ব্রাহ্ম' হলেও ব্রাহ্ম-ভাবনা বা ধর্ম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাঁর জাতীয়তাবোধের প্রধান উৎস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতন ধর্ম ভাবনা। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম' তাঁর দেশপ্রেমের চালিকা শক্তি। তিনি হিন্দুত্বকেই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত আধার বলে মনে করতেন। নিজের জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি ব্রাহ্ম আচরণ থেকে মুক্ত ছিলেন। এমন কি বিবাহের পূর্বে তিনি 'হিন্দু' মতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদান্তিক পুরুষ। পশ্চিমী রাষ্ট্র দর্শন ও বৈদান্তিক ভাবনা শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবোধের উৎস। এই জাতীয়তাবোধই তাঁকে দেশকে 'মাতৃ' রূপে কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর ভাষায় 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি; ভক্তি করি, পূজা করি।' দেশমাতৃকাকে রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করবার জন্য তিনি ক্ষত্র তেজ এবং ব্রহ্ম তেজের সাধনা করতে বলেছেন। এবং সেই তেজ 'জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত'। ভারত পতিত হয়েছে তার ক্ষাত্র ধর্ম হারিয়ে। আর্য ধর্মকে যথার্থ উপলব্ধি না করার কারণে ভারত পতিত হয়েছে। এই 'আর্য' ধর্ম পাশ্চাত্য ধারণার 'ধর্ম' নয়। পাশ্চাত্য 'আর্য' শব্দটিকে জাতিবাচক ও (racial ethnological) শব্দে পরিণত করেছে। আর্য ধর্ম বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝায় আত্ম-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ। এই সংস্কৃতি বাইরের ও ভেতরের শক্তি। এই শক্তির জাগরণ ঘটাতে আমাদের ধমণীতে যে রক্ত প্রবাহিত তাকে আর্যত্বে শুদ্ধ করতে হবে। ভারতীয়দের চিন্তাশক্তির সাধনা করতে হবে। নতুন জাতীয়তাবাদের উপাদান হচ্ছে ক্ষত্রিয়ত্ব, নব আর্যশক্তি এবং বিজ্ঞানের শক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ঘটবে আধ্যাত্মিক পথে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জাগরণ ব্যতীত জাতীয় জাগরণ অসম্ভব। এই জাগরণ কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডির অন্তর্গত নয়। এই জাতীয় ধর্ম হবে সর্বজনীন। সনাতন ধর্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অরবিন্দ বলছেন '...a body of spiritual knowledge and experience of which india has always been destined to be guardian exemplor and missionary. This is the sanatan dharma, the eternal religion.' (On Nationalism page 328). যে হিন্দুত্বের কথা অরবিন্দ বলেছেন তাঁর ভাষায়— 'Hinduism is in the first place a non-dogmatic inclusive religion and would have taken even Islam and Christianity into itself...' এরপর এরই সঙ্গে বলেছেন 'if they had tolerated the process.' (India's Rebirth, Pg 143). হিন্দুর দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'Hinduism has always been pliable and aggressive; ...whenever it has stood on the defensive, it has contracted within narrow limits and shown temporary signs of decay.' শ্রীঅরবিন্দ হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ভারতমাতা, মুসলমানদেরও তার সন্তানের মতন তার বক্ষে স্থান দিয়েছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদ শিবাজী এবং রামদাসের সময় মুসলমান শাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করে জাতীয় জাগরণ ঘটাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই স্থানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত। এই ইংরেজদের ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু মুসলমানদের একটি 'বিজাতীয়' ভাবনা আছে যা তাদের হিন্দুদের সঙ্গে কিছুতেই মিলিত হতে দিচ্ছে না। মুসলমানদের কাছে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি ভিন্নতর। তিনি বলেছেন 'The Mahommedans base their separateness and their refusal to regard themselves as Indians first and Mahommedans afterwards' (On Nationalism).

মুসলমানদের মধ্যে ভারতের তুলনায় বিশ্বের অন্য মুসলমান দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। 'in spite our common birth and blood.' হিন্দু তার মাটির বন্ধনে আবদ্ধ। সে তার মা-কে অস্বীকার করতে পারে না। অরবিন্দ বলেছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দু ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ হিন্দু তার অতীতের মহত্ব ও গর্ব নিয়ে দেশ গঠন করেছে। এই মহত্ব নিয়ে সে মুসলমানদেরও গ্রহণ করতে পারে। সমস্ত মুসলমানকে না হোক বহু সংখ্যক মুসলমান নিয়েই 'স্বরাজ' অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু গান্ধীজির হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনার উপর অরবিন্দের কোনও আস্থা ছিল না 'Hindu-Muslim unity should not mean the subjection of the Hindus... The best solution would be to allow the Hindus to organize themselves and the Hindu-Muslim unity would take care of itself, it would automatically solve the problem.' (India's Rebirth, Pg. 165)

মুসলমানরা যদি মনে করে যে তাদের ধর্মের বা বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববাসীরা এক না হতে পারে তবে তাদের এই অসহিষ্ণুতার জন্য 'I do not think assimilation is possible.' গান্ধী এবং কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের বিষয়টি একটি অযৌক্তিক-পূজায় (fetish) রূপান্তরীত করেছে।

কোনও একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ঐক্য স্থাপিত হয় না। অরবিন্দ এই কারণেই 'বন্দেমাতরম'-এর অঙ্গচ্ছেদ করে তা পরিবেশনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এর অর্থ ছিল হিন্দুকে তার সাংস্কৃতিক অঙ্গের ক্ষতিকে মেনে নিতে বলা। ১৯৩৯ সালে অরবিন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিয়ে যা বলেছেন তা সাভারকারের ভাবনারই প্রতিধ্বনি। ভারতীয় ধর্ম-শিক্ষা-কৃষ্টি বাদ দিয়ে ভারতীয় জাতি বা জাতীয়তাবাদ গঠিত হতে পারে না। ধর্মের দিক থেকে একটি বহুত্ববাদী দেশকে হিন্দুত্ব বাদ দিয়ে রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা যায় না। অর্থাৎ মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে যেমন দেশ নয়— তেমনই হিন্দুকে বাদ দিয়েও ভারত না। সুতরাং ভারতীয় মুসলমান নেতারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনে 'আমার ধর্মই একমাত্র সত্য এই মনোভাব পরিত্যাগ না করলে অরবিন্দ-এর সহচর ও বিবেকানন্দ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় 'aggresive Hinduism'-ই সত্য বলে গৃহীত হবে।

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোকে

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং

সৌমিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

বহুদিন আগে বাংলায় ঘটে যাওয়া এক ভয়ঙ্কর ঘটনা নিয়ে অনেকের স্মৃতিতে হয়তো মরচে ধরেছে। কেউ কেউ হয়তো ভুলে গেছেন। স্বাধীনতার কর্তব্যকালে, এই ঘুমিয়ে থাকা ইতিহাসকে দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের স্বাধীনতার ৭৬তম বার্ষিকীতে তাই আরও একবার 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নিয়ে ফিরে দেখা।

'Those that fail to learn from history are doomed to repeat it' —দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের অধিনায়কত্ব করা কুখ্যাত সেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill একথা বলেছিলেন যার অর্থ 'যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না তাদের এই সর্বনাশের পুনরাবৃত্তি দেখতে হয়'।

সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বক্তিয়ার খিলজির আমল থেকে আরম্ভ করে ক্রমাগত বিদেশী দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বাংলা। এই তুর্কী ও আফগান দস্যুরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে, ধ্বংস করতে থাকে হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলি। আর তার সাথে নিরন্তর চলতে থাকে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ। অধুনা ভারতের অধিকাংশ মুসলিমই কিন্তু আসলে বেশ কয়েক প্রজন্ম আগে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন ইসলামে। তুর্কি, ইরান, আফগান আর আরবের বিদেশী মুসলিম বংশধরদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলিমরা শুধু যে তাদের ধর্ম হারিয়েছিলেন তা নয় তারা হাজার হাজার বছরের সনাতন ধর্মের সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষাও হারিয়েছিলেন। ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে এই নগণ্য সংখ্যক এক বা দুই শতাংশ বিদেশী মুসলিমরা আসলে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলিমদের সামগ্রিক ভাবে সামাজিক এবং আর্থিক শোষণ করে চলেছিল।

এবারে আসা যাক সমসাময়িক ইতিহাসের পাতায়। বিংশ শতাব্দী আরম্ভের কিছু আগে থেকে অখন্ড ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ধনী এবং সচ্ছল মুসলিমরা ব্রিটিশদের কাছে মুসলিমদের জন্য পৃথক সুযোগ সুবিধার আর্জি করতে আরম্ভ করেন। এর ফলস্বরুপ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন সেই সময়ের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে এদের বিন্দুমাত্র অবদান ছিল না। উল্টে এরা ব্রিটিশদেরই পদলেহন করে গেছিলেন। সেই শুরু। তার পর থেকে মুসলিম লীগের পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। মহম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা সেই জিন্নাহর বাবা আর ঠাকুর্দা কিন্তু ছিলেন গুজরাতের কাঠিয়াবাড়ের ব্যবসায়ি মানুষ। জিন্নাহ আইন পড়েছিলেন এবং বম্বে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। পরে এক সময়ে বিলেতে ফিরে যান এবং সেখানে আইন ব্যবসার নিযুক্ত হন। চল্লিশের দশকে আবার বম্বে ফিরে এলেন পৃথক পাকিস্তানের দাবির বিষবৃক্ষ সঙ্গে নিয়ে।

১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি কে হারিয়ে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় আসার পর তারা ঘোষণা করে ভারতবর্ষেও ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা পৃথকভাবে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করল। মহম্মদ আলী জিন্নার মুসলিম লীগ ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, ক্ষমতার লোভ দূরে সরিয়ে রেখে দেশের সমস্ত মুসলিমকে এক জোট হতে বললেন। পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবীতে মুসলিম ভিন্ন সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট না করে পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্লেবিসাইট চাইলেন!! কংগ্রেস বলল মৌলিক অধিকার অখন্ড ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং দারিদ্র নির্মূল করার কথা।

The States

170 KILLED AND OVER 1,000 INJURED IN CALCUTTA

"DIRECT ACTION" DAY ASSAULTS

WIDESPREAD LOOTING & INCENDIARISM

Amrita Bazar Patrika

CALCUTTA UNDER MOB RULE

JINNAH DECLINES NEHRU'S OFFER

161 Persons Killed And Over 800 Injured

CURFEW PROCLAIMED

Orgy Of Looting, Rioting, Stabbing & Incendiarism

ALLIED DESIGN IN ITALY AND GREECE

হিন্দু মহাসভার মতাদর্শ ছিল স্পষ্ট। তারা নির্বাচনী ইস্তেহারে বলল এই দেশের নাগরিকদের প্রত্যেকের জন্য নীতি হবে এক, তা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান বা কোন সংখ্যালঘু। রাজ্যগুলির ভৌগোলিক সীমার ভিত্তি হবে মূলত ভাষা এবং সংস্কৃতি। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ৩৫ কোটি ভারতবাসী, বিভিন্ন ধার্মিক বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, যদি ঐক্যবদ্ধভাবে অখন্ড ভারত গড়ে তুলতে পারি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি ও আমাদের অখন্ড ভারতকে টুকরো টুকরো করার কথা ভাবতে সাহস পাবে না।

অবিভক্ত বাংলার সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভাবনীয় সাফল্য পেল। বিজয় উল্লাসে মত্ত বহু মুসলিম নেতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানত হিন্দু বিরোধী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলো। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হল আমাদের মেদিনীপুরের বাসিন্দা মুসলীম লীগের হুসেন সুহরাওর্দী যাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে 'বাংলার কসাই' বলে জানি। ২৯শে জুলাই ১৯৪৬ বোম্বেতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ Direct Action অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করল।

১৩ই আগস্ট ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের কলকাতা জেলার সেক্রেটারি একটা নোটিশ জারি করলো স্টার অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায়। এই নোটিসে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেটিয়াবুরুজ এবং ২৪ পরগনার সমস্ত মুসলিমদের বলা হল ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ (শুক্রবার) জুম্মার 'স্পেশাল নামাজ' পড়ার পর বিকেল ৩টেয় কলকাতায় শহীদ মিনারের নিচে মুসলিমদের বিশাল সমাবেশে যোগ দিতে। মুসলিমদের জন্য একটা বিশেষ ম্যানুফেস্টো বা ঘোষণাপত্র তৈরি করা হলো এবং বলা হলো সেটা কলকাতার ৮ নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটের মুসলীম লীগের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে।

সম্পূর্ণ এবং সার্বিক হিন্দু বিনাশের উদ্দেশ্যে প্রায় কুড়িটি পয়েন্ট নিয়ে একটা গোপন সার্কুলার তৈরি করা হলো যেটা মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। আমি হলফ করে বলতে পারি সেই সার্কুলারের কুড়িটি পয়েন্ট যদি পাঠকরা পড়েন তবে তাদের রক্ত হিম হয়ে যাবে। এখানে একটি পয়েন্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন। সেখানে বলা হয়েছিল কোন জাতীয়তাবাদী মুসলিম যদি মুসলিম লীগে যোগদান করতে না চায় তবে তাদের যেন গোপন গেস্টাপো শৈলীতে হত্যা করা হয়! ভাবতে অবাক লাগে কোন রাজনৈতিক দলের তথাকথিত শিক্ষিত কিছু মানুষ কিভাবে এই বর্বর এবং নৃশংস চিন্তা মাথাতেও আনতে পারে! ৫ই আগস্ট ১৯৪৬ এ দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় বাংলার কসাই হুসেন সোহরাবুদ্দিন লিখল 'যে কোনো মুসলিমের পাকিস্তান দাবির মতো একটা মহৎ কাজের কাছে রক্তক্ষয় বা সার্বিক সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনাটা কোন মন্দ কাজ নয়।'

এরপরে এলো সাম্প্রতিক বাঙালি হিন্দুর ইতিহাসে সেই ভয়ংকর কালো দিন ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬, শুক্রবার। ভোর সাড়ে চারটে থেকে প্রধানত কলকাতা ও হাওড়ায় আরম্ভ হল হত্যা লীলা। শুরু হলো লুটপাট, হত্যা, দিকে দিকে, বস্তিতে বস্তিতে আগুন লাগানো ও হিন্দু নারী ধর্ষণ। মনুমেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রায় ৫০,০০০ মুসলমান কে আমাদের বাংলার কসাই সুহরাবরদী বলল 'তোমাদের হাতে ২৪ ঘন্টা আছে, যা পারো তাই করে নাও।' এরপর মনুমেন্টের জনসভা শেষে এই নৃশংস, বর্বর মানুষটি যে ছিল অখন্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী, গিয়ে বসল লালবাজারের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। পুলিশকে তাদের কোন কাজ করতে দিল না। রক্ষকই হয়ে উঠল ভক্ষক!

১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ এর অব্যবহিত আগে থেকে বহু হিন্দু এবং মুসলিম পুলিশ অফিসার বিভিন্ন সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এই বর্বর মানষটি সম্পূর্ণভাবে তা উপেক্ষা করে যায় কারণ সে চেয়েছিল এই হত্যা লীলা চালু হোক। হিন্দুদের 'উচিত শিক্ষা' দেওয়া ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। মুসলিম লীগের এই হত্যা লীলা এবং বর্বরতা চলেছিল বেশ কিছুদিন। সেই কয়েকদিনের তাণ্ডবের দিনলিপি নথিভুক্ত আছে। তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সময় এবং পরিসর এখানে নেই। মুসলিমদের দ্বারা এই দাঙ্গা, লুটতরাজ, হত্যা, হিন্দু নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ চলতেই থাকলো এবং ক্রমেই সম্প্রসারিত হলো পূর্ব বঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালী, বরিশাল ইত্যাদি স্থানে।

পাঠকেরা যারা এই পর্যন্ত পড়লেন তাদের মনে কি কোন প্রশ্নের উদয় হল? ১৬ই আগস্টকে 'খেলা হবে' দিবস বলে উদযাপিত করার পেছনে মমতার তৃণমূলের উদ্দেশ্যটা কি বুঝতে পারলেন? আশা করি বুঝেছেন। মমতা তার ব্যক্তিগত স্বার্থে, ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির খাতিরে মুসলিম তুষ্টিকরণ কে এমন এক ভয়ংকর অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে যেখানে বাংলার হিন্দুদের শংকিত এবং বিব্রত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সাহিত্য মিথ্যা বলে না। যদি সম্ভব হয় আপনারা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি অবশ্যই পড়বেন। ব্যোমকেশের স্রষ্টা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদিম রিপু' উপন্যাসের কয়েকটি ছত্র এখানে উল্লেখ করব। 'জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল তখন আমরা মৃত্যু দেবতাকে একেবারে ভালোবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসেবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সে কেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারিয়া বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমানকাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে?'

বিজেপির বৃদ্ধি ৭৬ শতাংশ

১৯ পাতার পর

১৭-১৮ জুলাই ২০২৩ বেঙ্গালুরুর মঞ্চে গঠিত হয়েছে আই.এন.ডি.আই.এ. জোট। মূলত পূর্বতন ইউপিএ জোটের শরিকরাই নাম পাল্টে গঠন করেছেন এই জোট। কিন্তু এই আই.এন.ডি.আই.এ. জোটের মূল যোগসূত্রটি ঠিক কী? খানিকটা ইতিহাসের পানে তাকালেই তা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি; বাম, কংগ্রেস ও সদ্যজাত আইএসএফের ব্রিগেড সমাবেশ; মঞ্চের পিছনে বড় ব্যাকড্রপে ততোধিক বড় অক্ষরে লেখা 'আমরাই ধর্মনিরপেক্ষ'। সমাবেশের মধ্যমণি আব্বাস সিদ্দিকী নামের এক আপাদমস্তক মৌলবাদী নেতা। যিনি বাংলার গ্রামেগঞ্জে ইসলামিক জলসা বা ওয়াজ করে বেড়ান। যিনি করোনা পর্বে ভারতের পঞ্চাশ কোটি মানুষের মৃত্যুকামনা করেছিলেন। বাইরের উচ্চারণে 'মানুষ' শব্দটি থাকলেও তার ভিতরের অর্থটি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। সময়যানে চেপে আরও খানিকটা পিছিয়ে যাওয়া যাক; ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট; মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন ও তাতে কমিউনিস্টদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট লিগের আয়োজিত সভার সঙ্গে ২০২১ এর ২৮ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেডের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য। উভয়তেই শোনা গেল একই জাতীয় অংশীদারিত্বের সুর। সাতচল্লিশে দেশভাগ হয়েছে; মুসলিম লিগ তার অংশ বুঝে নিয়েছে; পূর্ববঙ্গ কালক্রমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে; তবে তার মৌলবাদী চরিত্রের কোন বদল ঘটেনি। ব্রিগেডের সভা থেকে সেদিন শোনা গিয়েছিল দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা। বস্তুত এই দলিত-মুসলিম ঐক্য বিষয়টিকে শতাব্দীর সেরা প্রতারণা হিসেবে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। যে প্রতারণার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ পাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকারের মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের করুণ পরিণতি। যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমাজের অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন; নিম্নবর্গের দলিতসমাজ যার কথায়

সমাবেশের মধ্যমণি আব্বাস সিদ্দিকী নামের এক আপাদমস্তক মৌলবাদী নেতা। যিনি বাংলার গ্রামেগঞ্জে ইসলামিক জলসা বা ওয়াজ করে বেড়ান। যিনি করোনা পর্বে ভারতের পঞ্চাশ কোটি মানুষের মৃত্যুকামনা করেছিলেন।

লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবও সমর্থন করেছিল; দেশভাগের পরবর্তীকালেও তারা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিল যার ভরসায় সেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে তাঁর পদত্যাগপত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে পদত্যাগপত্রটি ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। সেদিন প্রাজ্ঞ যোগেনবাবুর বহু অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি ঘটেছিল পাকিস্তানে হিন্দুদের কোন জায়গা নেই। যারা এখনও রয়ে গেছেন তাদের ধীরে ধীরে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে হয় নিকেশ করা হবে, নয় ধর্মান্তরিত করা হবে।

এরই নবতম রূপ এই আই.এন.ডি.আই.এ. জোট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জোটের স্বরূপটি সম্যক রূপে অনুধাবন করেছেন; সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ও পিএফআই এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন 'ইন্ডিয়া' নামের আড়ালে এদের প্রকৃত চরিত্র যেমন লুকনো যায়নি, তেমনি এক্ষেত্রেও তা লুকনো যাবে না। পঞ্চায়েত ভোটে পরস্পর বিবদমান যে অসংখ্য সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকরা প্রহৃত ও নিহত হলেন, তাদের নেতারাই যখন হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে হাতে হাত ধরে পোজ দেন তখন এই নিহত মানুষগুলির আত্মার সঙ্গে যে প্রতারণা করা হয় তার কোন তুলনা চলে না। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবাদী শক্তির কাছে এই সুবিধাবাদী স্বার্থান্ধ জোট খড়কুটোর মত উড়ে যাবে আর তা নিশ্চিত করবে বাংলার সাধারণ মানুষ, ভারতের আপামর জনসাধারণ।

ফেক নিউজ

ফেক নিউজ

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত কিভাবে বিশ্বগুরু হয়ে উঠছে তা বর্ণনা করতে একটি ভিডিও রিলিজ করা হয়। কংগ্রেসের আইটি সেল সেই ভিডিওর মধ্যে থাকা ভারতের আসল মানচিত্রকে (চিত্র-১) নোংরাভাবে বিকৃত করে (চিত্র-২)। বিকৃত মানচিত্রে অখণ্ড ভারতকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করার পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও অন্যভাবে দেখিয়ে ভুল বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করে তৃণমূলের জোটসঙ্গী কংগ্রেস। কংগ্রেসের তরফে এই ফেক নিউজ ছড়ানোর চেষ্টা প্রমাণ করে নামে শতাব্দীপ্রাচীন দল হলেও তারা আদতে দেশ এবং জাতির শত্রু।

ফেক নিউজ

বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দল সমেত বিদেশী অর্থে পুষ্ঠ কিছু সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। তাই ঠিক যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে স্কুল কলেজ খোলার চেষ্টা করছে সরকার তখনই দু'মাসের পুরনো ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। বিরোধীরা অবশ্য এখানেই থেমে নেই। এই ঘটনায় সঙ্গে যুক্ত হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দু'জন কার্যকর্তার নাম ও ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়(চিত্র-৩)। যদিও ওই দুজনের সঙ্গে মণিপুরের ঘটনার দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই তা অচিরেই প্রমাণ হয়ে যায়। মিথ্যে খবর ছড়িয়ে রাষ্ট্রবাদী ও বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠনকে বদনাম করার চেষ্টা করে আসলে দেশকেই বিশ্বমঞ্চে ছোট করার প্রয়াসস্বরূপ।

ফেক নিউজ

এক দলিত মহিলাকে ধর্ষণ মামলায় রাজস্থানে রাষ্ট্রবাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপির তিনজন সদস্যের নামে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয় (চিত্র-৪)। যদিও আসল অপরাধীদের ধরতে অসমর্থ কংগ্রেসের পুলিশ আর কংগ্রেসের এই নোংরা ষড়যন্ত্র বুঝে নিতে মানুষের সময় লাগেনি।

ফেক নিউজ

চিত্র-৫। এটা এমন এক সংবাদপত্রের খবর যারা মুখে বলে ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় পায় না আর বাস্তবে তৃণমূল ও মমতা ব্যানার্জিকে তৈলমর্দন করে চলে। দেশ ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে এরা এবং এদের মত অনেকে হঠাৎ একদিন মিথ্যা খবর ছড়ায় যে রিজার্ভ ব্যাংকের ৮৮০০০ কোটি টাকা গায়েব। আরবিআই তথা সরকার যথা সময়ে ব্যবস্থা না নিলে (চিত্র-৬) এরকম ফেক নিউজ দেশের অর্থব্যবস্থা ভেঙে দিতে পারে লোক ক্ষেপিয়ে।

পশ্চিম বঙ্গ
ওপরের দিকে কেউ দেখবে না, সবাই মনিপুরের দিকে তাকাও,
TITAS PANDA

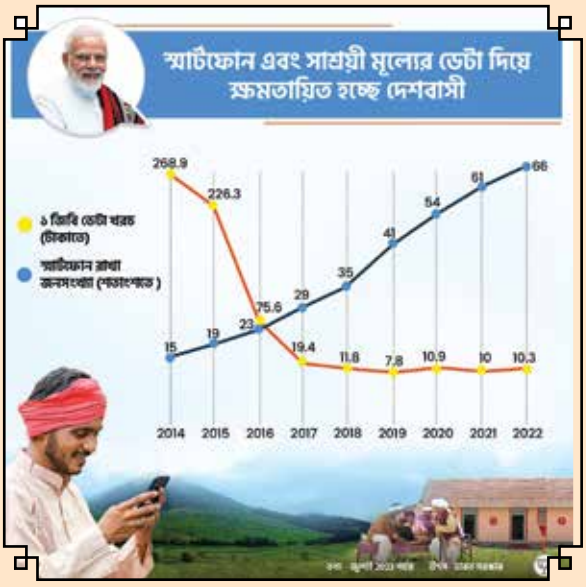

অমৃত ভারত প্রকল্পে বাংলার নিম্নলিখিত
রেল স্টেশন গুলির আধুনিকীকরণে মোট
১৫০৩.৪ কোটি টাকা
বরাদ্দ করলেন মোদী জী
ধন্যবাদ মোদী জী

এবার ভারতেই
কোয়ান্টাম কম্পিউটার
নিয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্র
সরকার বরাদ্দ করলো
৬০০০
কোটি টাকা
আত্মনির্ভর ভারত,
শক্তিশালী ভারত
@BJP4Bengal bjpbengal.org

স্মার্টফোন এবং সামগ্রী মূল্যের ডেটা দিয়ে
ক্ষমতায়িত হচ্ছে দেশবাসী
১ জিবি ডেটা খরচ (টাকাতে)
স্মার্টফোন রাখা জনসংখ্যা (শতাংশেতে)
268.9
226.3
75.6
19.4
11.8
7.8
10.9
10
10.3
15
19
23
29
35
41
54
61
66
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

মোদী সরকার নারী শক্তিকে
শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তুলছে
১ জুলাই, ২০২৩ অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিকেল এবং নন-মেডিকেল ক্যাডারে মহিলাদের সংখ্যা
আর্মি মেডিকেল কোর্ট (AMC)
১,২১২টি
আর্মি ডেন্টাল কর্পস (ADC)
১৬৮টি
মিলিটারি নার্সিং সার্ভিস (MNS)
৩,৮৪১টি
১ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মোট মহিলা অফিসারের সংখ্যা (AMC, ADC এবং MNS ব্যতীত) ৬,৭৩৩ জন

মাসের শুরুতেই সুখবর
বাণিজ্যিক LPG
সিলিন্ডারের দাম এক
ধাক্কায় কমলো প্রায়
১০০ টাকা
হোটেল বা ক্যাটারিং
ব্যবসায়ীদের মুখে ফুটল,
হাসি।
দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে সদা প্রচেষ্ট
মোদী সরকার

অভিনন্দন
ভারতীয় বিজ্ঞানীদের
মহাকাশে
৭টি স্যাটেলাইট
পাঠাল ইসরো
অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার
সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার
থেকে পিএসএলভি-সি৫৬ রকেটের
সাহায্যে মহাকাশে পাড়ি দিল
স্যাটেলাইট গুলি
বিজেপি শাসনে এগোচ্ছে দেশ,
এগোচ্ছি আমরা

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।